মায়াকন্যা

মনোজ বসু

৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

অনুজপ্রতিম কথাকার

শ্রীমান গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের

উপন্যাস

রূপবতী
মানুষ নামক জন্তু
রক্তের বদলে রক্ত
মানুষ গড়ার কারিগর
আগস্ট, ১৯৪২
এক বিহঙ্গী
ওগো বধূ সুন্দরী
জলজঙ্গল
নবীন যাত্রা
বকুল
বাঁশের কেল্লা
বৃষ্টি, বৃষ্টি!
ভুলি নাই
শত্রুপক্ষের মেয়ে
সবুজ চিঠি
সৈনিক
আমার ফাঁসি হল
বন কেটে বসত

ভ্রমণ

চীন দেখে এলাম ১ম
ঐ ২য়
সোবিয়েতের দেশে দেশে
পথ চলি
নতুন ইয়োরোপ : নতুন মানুষ

গল্প

মায়াকন্যা
গল্পপঞ্চাশৎ
গল্প-সংগ্রহ (১ম খণ্ড)
একদা নিশীথকালে
কাচের আকাশ
কিংশুক
কুঙ্কুম
খদ্যোত
দেবী কিশোরী
নরবাঁধ
পৃথিবী কাদের ?
মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প

নাটক

ডম্বরু ডাক্তার
চম্পক
নূতন প্রভাত
প্লাবন
বিপর্যয়
বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং
রাখিবন্ধন
শেষ লগ্ন
ডাকবাংলো (দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যায়িত)

মায়াকন্যা
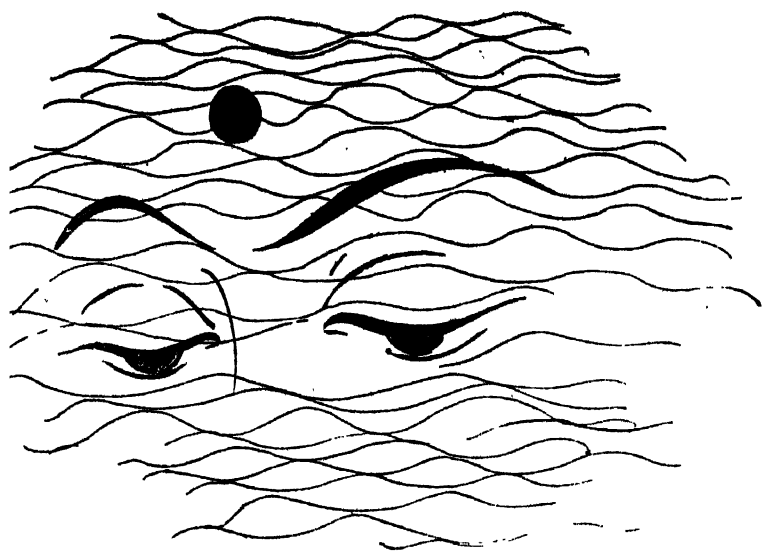
খাতা কেড়ে নিতে যায় আমার হাত থেকে। এই সময় ম্যানেজার এসে বললেন, চান করে নিন এবারে। বাথরুমে জল দিচ্ছে।

ইন্দিরারই সমবয়সি একটি মেয়ে টিউবওয়েল থেকে জল তুলে তুলে বাথরুমের টব ভরতি করছে। ম্যানেজার পরিচয় দিলেন: আমাদের মালির মেয়ে—কালীতারা। অতিথিশালার ঘর-দুয়োর ওদের জিম্মায় থাকে। আপনি আসছেন—রান্নার লোক খুঁজছিলাম এই ক'দিনের জন্য। তা কালীতারা আড় হয়ে পড়ল: লেখক-মানুষ বাজে লোকের রান্না খাবেন কি! আমি রাঁধব। রাঁধাবাড়া শুধু নয়—আপনার সমস্ত কাজ ও-ই করছে, আর কাউকে ছুঁতে দেয় না।

বলেন কি, অত ক্ষমতা ঐটুকু মেয়ের! রাঁধছেও খাসা।

ভাল মেয়ে, পড়াশুনোতেও খুব ভাল। আমরা এক বাংলা-ইস্কুল বসিয়েছি বাগানে। ফার্স্ট হয়।

কাল এসে পৌঁচেছি—তাই তো বটে! মেয়েটা চরকির মতো ঘুরছে সেই থেকে, পান থেকে চুন খসতে দেয় না। খেয়ে উঠতে না উঠতে দেখি, আঁচানোর জন্য জল গরম করে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আঁচিয়ে বসতে না বসতে ডিবে ভরতি পান। এর উপরে পড়াশুনো করে শুনে ভাল লাগল।

ঘুম-টুম দিয়ে সভায় গেছি। মস্ত সভা। এসব জিনিস এদিকে বড় একটা হয় না, অনেক দূর থেকে লোক এসেছে। লোক দেখে আমাদেরও মুখ খুলে যায়, দু-ঘণ্টা এক নাগাড়ে বক্তৃতা চালিয়েছি। অত লোক স্থির হয়ে শুনল। বাগানের কুলি-কামিন বেশির ভাগ—সাহিত্যের কী বুঝল তারা, কে জানে? কিন্তু হাততালির ঠেলায় অস্থির।

স্ফূর্তিতে ডগমগ হয়ে বাগানে ফিরলাম। সাড়ে-আটটার প্লেন

ধরব, স্টেশন পাঁচ মাইল, মোটে সময় নেই। নাকে-মুখে গুঁজে ছুটতে হবে এক্ষুনি।

তুমি সভায় গেলে না কালীতারা ?

ভ্রূভঙ্গি করে ইন্দিরা বলে, ও যাবে—তবেই হয়েছে! বসে বসে উনকুটি ভাগে ডাল-চচ্চড়ি রাঁধছিল।

পান দিতে এসে কালীতারা গলায় আঁচল বেড় দিয়ে ছু-পায়ের উপর প্রণাম করল।

তাইতো, কিছু দেওয়া তো উচিত। মনিব্যাগ খুলে ছুটো টাকা দিলাম: মিষ্টি খেও কালীতারা—

মোটরে হর্ন দিচ্ছে। ইন্দিরাকে বলি, স্যুটকেশটা বের করে দাও গাড়িতে। জামা পরে যাচ্ছি আমি।

তাকিয়ে দেখি, কালীতারার হাসিমুখ এদিকে কালো হয়ে গেছে। ছু-চোখে জল টলটল করছে।

কি হল ?

আমরা ঝি-চাকর, টাকাই তো দেবেন আমাদের!

খাটের উপর সেই পত্তর খাতা,একটু আগে শুয়ে শুয়ে দেখছিলাম। কালীতারা ছোঁ মেরেই খাতা তুলে নিল।

আমার খাতা এখানে আনল কে ?

খাতা নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঐ দরজা দিয়ে। একবার মুখ ফেরাল, অশ্রুর ধারা বইছে। টাকা ছুটো রেখে গেছে খাটের উপর।

হতভম্ব হয়ে আছি, এমন সময় ইন্দিরা ফিরে এল। আর ভুল করব না। সভায় পদ্মের তোড়া দিয়েছে, তোড়াটা তার হাতে তুলে দিলাম।

বারম্বার হর্ন দিচ্ছে। আর দাঁড়ানো চলে না।

কিন্তু গাড়িতে উঠে চশমা খুলে রাখতে গিয়ে দেখি, খাপ ফেলে এসেছি।

রোখো, রোখো—

আবার ঘরে গেলাম। বারান্দায় ম্যানেজারের গলা।

নর্দমায় ফেলে দিলি কেন? অত বড় মানুষটা উপহার দিলেন—

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ইন্দিরা বলছে, কালীকে মিষ্টি খাওয়ার টাকা দিলেন। আমার বেলা জঞ্জাল গুচ্চেরখানেক। খাটাখাটনি আমিও তো করেছি—

সুখী দম্পতি

পথ দীর্ঘ। গাড়িটা গোলমাল করছে কিছুক্ষণ থেকে। বারম্বার স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। শেষটা আর কিছুতেই স্টার্ট নেয় না। নেমে পড়ল ড্রাইভার। এটা টিপছে, ওটা খুলছে, ফুঁ দিচ্ছে একটা সরু নলে মুখ রেখে।

প্রফুল্ল খিঁচিয়ে ওঠে: কী হল বিহারী? কতক্ষণ লাগবে ঠিক করে বল।

ড্রাইভার বলে, কারবুরেটারে তেল যাচ্ছে না। ময়লা ঢুকেছে। এক্ষুনি হয়ে যাবে সার—দু-এক মিনিটের মধ্যে।

যেমন কাজকর্ম তোমার! গাড়ি ছুটিয়েই দায়-খালাস। ইঞ্জিনের দিকে দেখবে না তাকিয়ে। তাড়াতাড়ি কর। আসছি আমি।

প্রফুল্লও নামল। রক্ষা এই যে শহর জায়গা, এবং দুপুরবেলা। রাত দুপুরে বনজঙ্গল কিম্বা মাঠঘাটের ভিতর গাড়ি বিগড়ালে ভোগান্তির পার ছিল না।

বোধকরি স্ত্রীকে লক্ষ্য করেই কৈফিয়তের ভাবে প্রফুল্ল বলে, বন্ধু আছে আমার এখানে। সুবিধে পেলাম তো তার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। এক্ষুনি আসছি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

বলে হনহন করে সে চলল। মোড়ের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বীণাও তার পরে বেরিয়ে আসে গাড়ির ভিতর থেকে। বিহারী বলে, কড়া রোদ মা, মাথা ধরে যাবে।

বীণা বলে, গাড়ি তেতেপুড়ে আছে। ভিতরে মোটে বসা যাচ্ছে না। সেই ধর রোদ খেতে খেতে আসা হল তো এতখানি পথ—

তবে মা গাছতলায় ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ান। কতক্ষণ লাগবে কিছু বলা যায় না।

এই যে একেবারে মিনিট হিসাব করে বলে দিলে—দু-এক মিনিটে হয়ে যাবে।

বিহারী বলে, বাবুর কাছে কী আর বলব। কেন বলি তা-ও তো জানেন মা। সত্যিকথা আপনাকে বলা যায়, বাবুর কাছে বলব কোন সাহসে?

বলতে বলতে সে রাস্তার ধুলোয় শুয়ে পড়ে মোটরের নিচে চলে গেল। ঠুকঠাক করছে। একতলা বাড়ি একটা রাস্তার ধারে নর্দমার পাশে। বাড়ির লাগোয়া বকুলগাছ। বকুলতলায় গিয়ে বীণা গুঁড়ি ঠেশ দিয়ে দাঁড়াল।

বিহারী বেরিয়ে আসে খানিক পরে। বিরস মুখ। বলে, হয় না। বাবুকে তো যা-হোক একটা বলে দিলাম। রোগ কোনখানে ধরা যাচ্ছে না। আপনি কতক্ষণ ও-রকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন মা? রোয়াকে গিয়ে বসে পড়ুন। খুঁজেপেতে আমি একটা মিস্ত্রি নিয়ে আসি। দূরের পথ—গোলমালটা কোনখানে ভাল করে না দেখিয়ে যাওয়া যায় না। বাবু এর মধ্যে এসে পড়লে বলবেন সেই কথা।

বীণা হাসল: আসবে তার এখন কি! বন্ধুর বাড়ি গেছে, তারা কি এত সহজে ছাড়বে? পাঁচ মিনিট বলে গেল, পাঁচ ঘণ্টা না লাগলে বাঁচি এখন।

মিস্ত্রির খোঁজে ছুটল বিহারী। বীণা রোয়াকে বসল। বসেই ঠাহর হল, এই একতলা বাড়ির দুটো চোখ জানলা দিয়ে তার পানে

তাকিয়ে আছে। এতক্ষণে পুরোপুরি চিনে ফেলে দড়াম করে দরজা খুলে রোয়াকে এসে রীণাকে ছু-হাতে জড়িয়ে ধরল। রীণারই সমবয়সি বউমানুষ। মাধবী।

রীণা আমার ঘরের তুয়োরে! অবাক কাণ্ড, রীণা আমার রোয়াকের উপর! আমি তা বুঝব কেমন করে? চোখে দেখছি—দেখেও তো বিশ্বাস হয় না। চোখ কচলে দেখি আবার।

রীণা বলে, ধানবাদ থেকে ফিরছি। ও বলল, ট্রেনে কেন আর—এমন গাড়ি রয়েছে। গাড়িতে নিরিবিলি আরাম করে যাওয়া যাবে। তা গাড়ি খারাপ হয়ে গেল এই অবধি এসে।

রীণা বড়ঘরের বউ, মাধবী তা জানে। সুখে স্বচ্ছন্দে আছে তা-ও শুনেছে। এত বছরেও সে সুখে তিলেক ভাঁটা আসে নি—এখনো ছুটিতে নিরিবিলি খোঁজে। সংসারে অভাব-অনটন না থাকলে হয় বোধকরি এই রকম।

মাধবী কলকণ্ঠে বলে, বুঝেছি যে একটা-কিছু হয়েছে। নইলে এতবড় অঘটন—রীণা মিত্তির আমাদের পচা নর্দমার পাশে! ভিতরে আয়। গাড়ি যতক্ষণ ঠিক না হচ্ছে, সেটুকু সময় বসবি তো আমার কাছে? একা দেখছি, কর্তাটিকে কোথায় সরিয়ে দিলি এর মধ্যে?

বন্ধু পেয়ে গেছে, বলিস কেন! তুনিয়াময় ওর বন্ধু। বন্ধু এসে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

জড়িয়ে ধরে মাধবী ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। এতখানি বয়স হয়েছে, গায়ে কী জোর! ছোট্ট বয়সে রীণা কোনদিন তার সঙ্গে পারে নি, আজকেও পারল না। ঘরে নিয়ে বিছানার উপর বসাল। পুরানো শাড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে জানলার পর্দা—গরিবের বাড়ি, একটিবার নজর বুলিয়েই বোঝা যায়। কোনদিন মাধবী ফর্সা নয়—এখন আরও যেন পুড়ে গিয়ে কয়লার মতন হয়েছে। ধানবাদের কয়লাকুঠিতে কদম বলে আদিবাসী ছুঁড়িটা আছে, অবিকল সেই গায়ের রং। কষ্টে-তুঃখে এমন হয়েছে। এমন মেয়েটা, আহা, ভাল ঘরে পড়ে নি।

মাধবী বলে, উঃ কতকাল পরে দেখা! বিয়ে করে তোকে কলকাতায় নিয়ে গেল, কত যে কেঁদেছিলাম সেদিন! এখন কেউ কারো খোঁজ রাখি নে। ভাগ্যিস আজ মোটর বিগড়াল বাড়ির সামনে—

আঙুলের কর গণছে: এই কার্তিকে আট—পুরো আট বছর হয়ে গেছে। তারপরে এই দু-মাস। মনে হয় একেবারে সেদিনের কথা। মাস-বছর পাখনা মেলে উড়ে পালাচ্ছে।

মাধবীর বাম চোখের বাঁ-দিকটায় রীণার দৃষ্টি পড়ল। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

মাধবী বলে, কি রে?

কাল দাগ ওটা কিসের?

মারের দাগ। বলিস কেন, রেগে গিয়ে চাবির থোলো ছুঁড়ে মারল সেদিন। আর একটু হলে চোখটা যেত। কপাল গুণে রক্ষে হয়েছে।

রীণা তৃপ্তি ভরে শুনছে। মনে মনে আরাম পায়। দুর্গতির কথা সবিস্তারে শোনবার জন্য দরদের সুরে বলে, কী সর্বনাশ!

মাধবীর একবিন্দু যদি সঙ্কোচ-দ্বিধার ভাব থাকে! গরিব বাপ-মায়ের কাছে শিক্ষা পায় নি কিছু,ঘরকন্নাই কেবল শিখেছিল। নির্লজ্জ ভাবে কেমন বলে যাচ্ছে: ঝি-চাকর নেই, একলা হাতে সব করতে হয়। সব কাজ সময় মতন পেরে উঠি নে। বলে, পুলিপিঠে করবি বলেছিলি—নিয়ে আয়। পিঠের খুব ভক্ত কিনা! বলে, নিয়ে আয় এক্ষুনি। চুলের মুঠি ধরে এমন টান দিয়েছে, মাটিতে পড়ে গেলাম। তাতেও রাগ যায় না, ঝনাৎ করে চাবি ছুঁড়ে মারল।

রীণা শিউরে উঠে বলে, এই অত্যাচার করে যাচ্ছে পুরুষে। সভ্য জগতে বাস করি, কোন রকম এর প্রতিকার নেই?

মাধবী হতাশ সুরে বলে, প্রতিকার চিতেয় যবে উঠব, সেইদিন। তার আগে নয়। এক-পা ধুলো নিয়ে বাইরে থেকে এসে হুকুম

ঝাড়বে, পা ধুইয়ে দে। ধপাস করে বিছানায় শুয়ে বলবে, গায়ে লেপ জড়িয়ে দে ভাল করে। সীতারামের সুখ আর কাকে বলে! এর মধ্যে দৈবাৎ পান থেকে চুন খসেছে তো রক্ষে নেই।

রীণা ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ে। আট বছরের ছাড়াছাড়ি, কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হল অভিন্নহৃদয় হয়ে গেছে সে মাধবীর সঙ্গে। সেই ছোটবেলার মতো। কণ্ঠে অগ্নিজ্বালা নিয়ে বলে, ঠিক, ঠিক! আমারও তাই। পুরুষ ওরা সবাই এক রকম। চুপচাপ সহ্য করি বলে আরও পেয়ে বসে। আমি তো ঠিক করেছি, লজ্জা করে আর বোঝা হয়ে থাকব না।

ঘাড় নেড়ে মাধবী জোরে জোরে সায় দেয়ঃ যা বলেছিস। বাইরে একেবারে কেঁচো, যত বীরত্ব বাড়ির মধ্যে এসে। আমরা সয়ে যাই কিনা! ঐ যে এলেন এবার বীরপুরুষটি। এরই মধ্যে হয়ে গেল পড়াশুনো? ছুটি নিয়ে জল খেতে এসেছ—তা জলের কলসি কি কোলের মধ্যে আমার?

দেবশিশুর মতো মাধবীর সাত বছরের ছেলে 'জল খাব' বলে ঝুপ করে মায়ের কোলের উপর বসে পড়ল।

মাধবী বলে, ড্যাব-ড্যাব করে দেখছ কি খোকন? মাসিমা হয়। প্রণাম কর। কেমন ভিজে-বেড়ালটি দেখছিস তো রীণা, বাইরের লোকের সামনে এমনি। ঘরের মধ্যে বীরত্বের নমুনা এই রয়েছে আমার চোখের উপর।

রীণার মুখের উপর কে যেন ছাই মেড়ে দিল। চোখের দৃষ্টি ধ্বক করে জ্বলে উঠে শীতল হয়ে গেল একেবারে। টেনে টেনে সে বলে, আমার ঘরে ছেলেপুলে নেই। ছেলেপুলের বেহদ্দ ঐ একটা মানুষ। বলি কাজ নেই বিধাতা আমার ছেলেপুলের। একজনকে সামলাতে হিমসিম হয়ে যাচ্ছি। ঐ যা বললাম ভাই, পুরুষ হলেই সব একরকম। বয়সের বাছবিচার নেই। জানিস তো, কলকাতা রামময় রোডের উপর শ্বশুরবাড়ির ভরভরন্ত সংসার। ঠাকুর-চাকর-ঝি নিয়ে জন তিরিশ

অন্তত। তার মধ্যে থেকে টেনে-হিঁচড়ে আমায় নিয়ে কলিয়ারির কুঠিতে উঠল। যে খেয়াল একবার মাথায় উঠবে! বলে, দু-জনে বেশ একা একা····হি-হি হি-হি—লজ্জাও করে বলতে!

হেসে আর কূল পায় না রীণা। হাসির তোড়ে কথা-শেষ করতে পারে না। বলে, ফিরতে কি চায়! জেলের গাড়িতে যেমন কয়েদি পুরে নেয়, তেমনি জবরদস্তি করে এই ফের কলকাতা নিয়ে চলেছি।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে রীণা তড়াক করে উঠে পড়ল: ড্রাইভার এসে গেল। যাচ্ছি ভাই। বিস্তর পথ এখনো, রাত্তির হয়ে যাবে।

তোর কর্তাকে দেখালি নে একটু?

ঐ যে বললাম—বন্ধুর বাড়ি। গিয়ে না পড়লে উঠবে? সন্ধ্যে হয়ে গেলেও হুঁশ হবে না। কী মুশকিল যে ওদের চালিয়ে নিয়ে বেড়ানো!

কথা বাড়তে না দিয়ে রীণা ঘর থেকে একরকম ছুটে বেরিয়ে একেবারে গাড়ির খোপে ঢুকে পড়ল। ড্রাইভারকে তাড়া দিচ্ছে: শিগগির চল, শিগগির—আঃ, কী দু-জনে তোমরা বকবক করছ? চালাও।

বিহারী বলে, মিস্ত্রি নিয়ে এলাম। ভাল করে দেখে দিক, কেন ও-রকমটা হচ্ছে—

রীণা বলে, গাড়ি চালাতে বলছি, কথা শোন না কেন? তুমি আর মিস্ত্রি ঠেলেঠুলে স্টার্ট করিয়ে নাও।

মেজাজ দেখে বিহারী ভয়ে ভয়ে বলে, দু-কদম গিয়ে আবার স্টার্ট বন্ধ হবে। সেইজন্য বলছিলাম।

অধীর কণ্ঠে রীণা বলে, মিস্ত্রি দেখানো হবে এই জায়গা থেকে সরে গিয়ে। এ বাড়ির সামনে নয়। তোমার বাবু এসে না পড়ে এখানে। বন্ধুর বাড়ি চল যাই। টেনে-টুনে সেখান থেকে গাড়িতে তুলতে সময় লাগবে। ততক্ষণে তোমরা ইঞ্জিন দেখো।

বিহারী বলে, বন্ধুর বাড়ি আমার তো জানা নেই মা।'

মিস্ত্রি লোকটার দিকে তাকাল একবার রীণা। কারবুরেটার খুলে ফেলে নিবিষ্ট হয়ে সে পরীক্ষা করছে। নিম্নকণ্ঠে রীণা বলে, আমি জানি বন্ধুর বাড়ি। বাজারের মধ্যে যে শুঁড়িখানা দেখে এলে, সেইখানে। আটটা বছর ঘর করে জানতে কিছু বাকি নেই বিহারী। বাজারের আশেপাশে কোনখানে গাড়ি রেখে তোমরা মিস্ত্রি দেখিও। ঢের ঢের সময় পাবে।

চোখে জল ভরে এল। বলে, কদম মাগিটা মনুষ্যত্ব কিছু থাকতে দিয়েছে ওর মধ্যে! পুরানো লোক বলে তোমাকেও তো একটু সমীহ করে নি। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে কলিয়ারিতে গিয়ে পড়েছিলাম তাই। কোন রকমে এখন কলকাতায় নিয়ে তুলতে পারলে বাঁচি। ভদ্রলোকের পাড়া থেকে বেরিয়ে পড় বিহারী। ভয়ে আমার গা কাঁপছে।

ট্যাক্সিওয়ালা

ভদ্রলোকের ছেলে ট্যাক্সি চালিয়ে খাই। মিথ্যে বলব না। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল তখন, খালি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলাম। দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে ওঁরা ট্যাক্সি ট্যাক্সি—করে ডাকলেন। গাড়ি থামিয়েও ছিলাম, কিন্তু নিই নি ওঁদের। দোষ আমার বটে। হয়তো ফাইন করবেন হুজুর। হয়তো বা লাইসেন্স বাতিল করবেন। তবু আমি মিথ্যা বলব না। দশটা মিনিট সময় দিন, আগাগোড়া বলি।

মাস ছয়েক আগে সেদিনটাও খুব বর্ষা। শিয়ালদা স্টেশনে প্যাসেঞ্জার এনে নামিয়েছি। দূর থেকে একজন ডাকছেন, রোখো রোখো—বালিগঞ্জে যেতে হবে। আর কাছের এক বুড়ামানুষ বললেন, বাবা আমরা ধর্মতলায় যাব—সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে। রোগা মেয়েকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।

এবং সেই মেয়ের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, দাঁড়িয়ে থাকিস নে ডলি। মাথা ঘুরে পড়বি। বোস ওইখানে।

ধুলোর মধ্যে ওখানে কেন? গাড়িতেই উঠে বসুন একেবারে।

বালিগঞ্জের প্যাসেঞ্জার ইতিমধ্যে এসে এই মারে তো এই মারে: এঁদের তুললে গাড়িতে—আমি আগে ডাকি নি?

আজ্ঞে না। এঁরা যাবেন ধর্মতলায়, আপনি সেই বালিগঞ্জে। বেশি ভাড়া ছেড়ে তা হলে অল্প ভাড়া কেন ধরব বলুন।

গাড়ির ভিতর থেকে বুড়ামানুষটি গদগদ হয়ে উঠলেন: ভদ্রলোকের ছেলে বলেই এমন দয়াধর্ম। চিরজীবী হও, নামটি কি তোমার বাবা?

রাখালচন্দ্র দে—

সামনে চেয়ে গাড়ি চালাচ্ছি, কান দুটো পিছনে খাড়া রয়েছে। দত্তপুকুরের কাছাকাছি এক গাঁ থেকে আসছে। তিন জন—বাপ, মেয়ে আর গাঁয়েরই এক ছোকরা ডাক্তার। মেয়ের পেটজ্বালা করে, জ্বর হয়, শুকিয়ে সলতের মতো হয়ে যাচ্ছে সে দিনকে-দিন। ছোকরাই এতদিন চিকিৎসা করেছে, হালে পানি না পেয়ে কলকাতায় বড়-ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

সামান্য পথ, মিনিট দশেকে পৌঁছে দিলাম। বুড়া বললেন, তোমার ডাক্তার কত সময় নেবেন বল তো অতুল।

অতুল বলে, বড়-ডাক্তার বেশি সময় দিয়ে দেখেন না। তা হলে পোষাবে কেন ?

বুড়া বললেন, সাতটার আগে ফেরা যায় যদি, দেখ। নয় তো একবারে সেই ন'টা সাতাশ। বাড়ি পৌঁছুতে রাত দুপুর হবে।

সে আশা ছেড়ে দিন কাকা। চেম্বারে যা ভিড়—সাতটা পর্যন্তই হয়তো বসে থাকতে হবে আমাদের।

নেমে পড়ল অতুল। বলে, ভিতরে গিয়ে দেখে আসি। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আপনারা ততক্ষণ গাড়ি-বারাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়ান।

আমি বললাম, গাড়ি-বারাণ্ডায় দাঁড়াবেন কি রকম! ওখানে জলের ছাট যাচ্ছে।

ডলি বলে, দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াব আমি। ছাট লাগবে না।

তরুণী মেয়ের দিকে না তাকিয়ে বুড়াকেই খানিকটা শাসনের সুরে বলি,ওদিকে বলছেন নাড়িতে জ্বর রয়েছে। যেমন আছেন, থাকুন তেমনি বসে। ভাড়া চোদ্দ আনা উঠেছে। ফ্লাগ নামিয়ে দিচ্ছি। যতক্ষণই থাকুন আর ভাড়া উঠবে না।

ডলি তবু আমারই দিকে দৃষ্টি মেলে বলে, প্যাসেঞ্জার ধরুন গে রাখাল-দা। আর কেন লোকসান সইবেন আমাদের জন্যে ?

দাদা হয়ে গেছি, তবু কিন্তু লজ্জা লাগে। কথাবার্তা বুড়ার দিকে চেয়েই চলছে ঃ একলা একটা মানুষ—অত প্যাসেঞ্জার খোঁজাখুঁজির

গরজ কী আমার! গাছের তলায় দিব্যি আছি। আমি নড়ছি নে। আপনারা নেমে গেলেও না।

অতুল ডাক্তার ফিরে এল এমনি সময়ঃ কপাল ভাল কাকা। বৃষ্টিবাদলায় একদম রোগিপত্তর আসে নি। চেম্বার খালি। ভাল হল, সাতটার গাড়িতেই ফেরা যাবে।

ভাড়া দিতে যাচ্ছেন, বললাম, এখন কেন? সাতটার গাড়িতে যাবেন তো? আমি রইলাম, আমিই নিয়ে যাব। ভাড়া এক-সঙ্গে দেবেন।

বুড়া বললেন, না বাবা। মেয়ে রাগ করছে। আর বসিয়ে রেখে তোমার ক্ষতি করব না।

এতক্ষণ থেকে একটুর জন্য প্যাসেঞ্জার ফেলে যাব—সে হচ্ছে না। বৃষ্টির মধ্যে আপনারাও ট্যাক্সি পাবেন না। সাতটার গাড়ি ফেল হবে। রোগা মানুষ নিয়ে রাত দুপুর অবধি ভোগান্তি।

ডাক্তার দেখিয়ে ওঁরা গাড়িতে এসে উঠলেন। মুখ গম্ভীর, কথা-বার্তা নেই। রোগটা কি, জানবার জন্য আকুলিবিকুলি করছি। কিন্তু ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে সে সব কেন বলতে যাবেন? এই বুঝলাম, আসছে বুধবার আবার এসে নানা রকমের এক্স-রে ছবি নিতে হবে।

দুটো টাকা দিলেন, চার আনা আমি ফেরত দিচ্ছি। বুড়া বললেন, দিতে হবে না বাবা।

যাতায়াতে সাতসিকে উঠেছে। পাওনার বেশি তো ভিক্ষে। সে আমি নিই না।

বুড়া বললেন, হিসাব ধরলে পাওনা তো অনেক বেশিই হয়। সে যাক গে! ভিক্ষে আমিই নিলাম। ছ-টাকার অষুধ লাগল পয়লা দিন, আর অতুলের খাতিরে ডাক্তারের অর্ধেক ফী আট টাকা। আরও কত লাগবে অমন! টাকা গিয়ে ডলি আমার এখন ভাল হয়ে উঠলে হয়।

পরের বুধবারেও আসছেন ঐ গাড়িতে। দূরের ভাড়া এসেছিল, আমি নিই নি। ঠিক সময়ে স্টেশনের স্ট্যাণ্ডে চলে এসেছি। পাছে প্যাসেঞ্জারে ডাকে—ডাকলেই তো নিয়ে যেতে হবে—বনেট উঁচু করে তুলে এটা-ওটা খুটখাট করছি। অর্থাৎ যন্ত্রপাতির কোন দোষ হয়েছে, গাড়ি চলবার অবস্থায় নেই। নজর কিন্তু আমার যন্ত্রপাতির দিকে নয়, প্ল্যাটফরমের যত প্যাসেঞ্জার বেরিয়ে আসছে তাদের দিকে। ডলিদের দেখছি না, আর আমি অধীর হয়ে পড়ছি। আসে নি তারা? অসুখ বেড়েছে খুব—শহরে এনে ডাক্তার দেখাবার অবস্থা নেই? অথবা আমার অলক্ষ্যে অন্য কোন ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেছে?

না, মিথ্যে ভয়। দেখা দিল তারা অবশেষে। বুড়া এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।

এই যে, আমি রয়েছি—আমি নিয়ে যাব। রোগা মানুষ স্ট্যাণ্ড অবধি নিয়ে যেতে হবে না। গাড়ি নিয়ে আসছি।

ডলি বলে, গাড়ি আজ বড্ড যে ঝকঝকে দেখাচ্ছে রাখাল-দা।

কাদা মেখে যাচ্ছে-তাই হয়েছিল, কাল সার্ভিস করিয়েছি। সিটের কভারও ধোবার বাড়ি দিয়েছিলাম।

ধর্মতলার চেম্বারের সামনে পৌঁছে বুড়া বললেন, চলে যাও তুমি। আজ অনেক দেরি হবে।

হোক না দেরি। তেল পুড়িয়ে কোথায় এখন প্যাসেঞ্জারের তল্লাসে ঘুরব! কত ট্যাক্সি ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে। আমার তো স্টেশন অবধি ভাড়া ধরা রইল।

তিনজনে চেম্বারে ঢুকলেন। বুড়া ফিরে এলেন অনতিপরেই: কী ভিড়, বাপরে বাপ! পয়সা রোজগার করছে বটে! বসবার জায়গা নেই। তুমি থেকে গেলে তো গাড়ির ভিতরেই একটু বসি বাবা।

বসুন না—

দরজা খুলে দিলাম। বুড়া বলছেন, মন ভাল নয় বাবা। মেয়ের সামনে বলা যায় না—ক্যান্সার বলে সন্দেহ করছে।

ডাক্তার নই, রোগপীড়ের কিচ্ছু জানি নে—তবু কেন জানি ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলাম, হতেই পারে না—ভয় দেখাবার জন্য ওরা ক'টা রোগের নাম শিখে রেখেছে।

ফুল-চন্দন পড়ুক বাবা তোমার মুখে। ওর মা তো শোনা অবধি অবিরাম চোখের জল মোছেন, আর মাথা কোটেন গোবিন্দবাড়ি গিয়ে। মেয়ের কিছু হলে পাগল হয়ে যাব আমরা।

কাজ সেরে ডলি আর অতুল ডাক্তার ফিরে এল। পরশুদিন সঠিক ব্যাপার জানা যাবে। রোগি আনতে হবে আবার সেই সামনের বুধবারে।

কী হল আমার—সেই বুধবারেও স্টেশনে এসেছি। উদ্বেগে আজ গাড়ির ভিতরে নেই। গাড়ির চাবি এঁটে প্লাটফরমে ঢুকে পড়েছি। ইঞ্জিন এসে দাঁড়াল, সতৃষ্ণ চোখ তাকিয়ে আছি। এক্স-রে করে কী জানা গেল—কী কথা শুনতে হয় না জানি আজ বুড়োকর্তার মুখে! ডলি নয়—আমারই মরণ-বাঁচন যেন সূক্ষ্ম সূতায় ঝুলছে।

খবর ভাল, দেখেই বুঝলাম। দেমাকে অতুল ডাক্তার ফেটে পড়ছে: বলেছিলাম না কাকা? গাঁয়ের ছেলে বলে ভরসা করতে পারেন না। লক্ষণ শুনে নিয়ে যা আমি বলেছিলাম, বড়-ডাক্তার আধ ডজন এক্স-রে প্লেট নিয়ে একগাদা টাকা গচ্চা লাগিয়ে ঠিক তাই বলল। এই যে, তুমি এসে গেছ দেখছি। আজকে শেষ। আর আসছি নে আমরা। আজ শুধু একটা প্রেস্ক্রপসন নিয়ে চলে যাব।

ধর্মতলা অবধি পথটুকু কী হুল্লোড়ে কেটে গেল! রোগ এমন-কিছু নয়, দীর্ঘ দিনের বদহজম থেকে দাঁড়িয়েছে। একটু কিন্তু দুঃখও লাগছে মনে। একেবারে এত সামান্য রোগ! আর আসবেন না ওঁরা, ট্যাক্সি ভাড়া করবেন না।

কিন্তু পূজোর সময়টা এই সেদিন দেখা। তিনজন নয়, দু-জন ওরা

এসেছে—ডলি আর অতুল ডাক্তার। একগাদা জিনিস কিনেছে—পাঁচ-সাতটা প্যাকেট। বিষম বৃষ্টি। খালি গাড়ি নিয়ে আমি আস্তে আস্তে যাচ্ছিলাম। দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে ডলি ডাকছে, ট্যাক্সি, এই ট্যাক্সি—

তাকিয়ে দেখেই চিনতে পেরেছি। নেমে পড়ে হাসিমুখে যাচ্ছি ওদের কাছে। ফুটপাথটুকু পার হতেই ভিজে জবজবে হয়ে গেলাম। ডলির সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর, মুখ-ভরা ঝলমলে হাসি। ছ-মাস আগেকার সেই অসুখের অবস্থা ভাবতে পারা যায় না। ডাক্তার আর রোগি নয় এখন, স্বামী আর স্ত্রী।

অতুল বলে উঠল, আরে, চেনা লোক! দু-তিন বার গেছি এর ট্যাক্সিতে।

ডলি সেই কথার জের ধরে বলে, ভাল হয়েছে। প্যাকেটগুলো নিয়ে তোল দিকি ড্রাইভার।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলি, মুটে ডাকুন। মাল বওয়া আমার কাজ নয়।

বৃষ্টিতে মুটে কোথায় এখন? তিনটে চারটে প্যাকেট তুমি নিয়ে নাও। বাকিগুলো আমরা হাতে হাতে নেব।

কথা সত্যি। মুটে ছিল না। আর অত জিনিস ট্যাক্সিতে বয়ে নিয়ে তোলা একবারে হত না। বৃষ্টিতে নেয়ে যেতেন ওঁরা। কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা আমি তার কি জানি

বিপন্ন ডলি বলে, মিটারে যা পাওনা হয়, তার উপর আট আনা বেশি ধরে দেব ড্রাইভার। নিয়ে নাও।

পাওনার বেশি তো ভিক্ষে। ভিক্ষে আমি নিই নে।

গাড়িতে ঢুকে স্টার্ট দিয়েছি। অতুল চেঁচাচ্ছে, রোখো—জিনিসপত্তোর আমরাই বয়ে নিচ্ছি।

গাড়ি খারাপ আছে আমার—

গালিগালাজ করে স্বামী-স্ত্রী মিলে। গাড়ির নম্বর নিল। তারপরে এই দরখাস্ত ঝেড়েছে হুজুরের কাছে।

হিন্দু-মুসলমান

সেকালের অদূরদর্শী মুরুব্বিরা যেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেছেন চালে আর ডালে মিশিয়ে। মুসলমানে আর হিন্দুতে। এর কানাচে ওর ঘর। ওর উঠান দিয়ে এর বাড়ি যাবার পথ। কে হিন্দু, কে মুসলমান —এখন বাছাবাছি ও ভাগাভাগির দিন এসে গেল। র‍্যাডক্লিফ সাহেব বিলেত থেকে বাঁটোয়ারা করতে এসে ভেবে পাচ্ছেন না, লাইনটা কোনখান দিয়ে টানবেন। টালবাহানা হচ্ছে, সঠিক সীমানা আজও এসে পৌঁছল না।

জেলা খুলনা, থানা মূলঘর, গ্রাম খালবুনা। পূর্ণচন্দ্র সমাদ্দার ও খোরশেদ খাঁ পড়শি মানুষ। নিতান্তই এবাড়ি-ওবাড়ি, মাঝখানে শুধু একটা বাঁশবন। খোরশেদের বাড়ির পোষা মুরগি চলে আসে পূর্ণর ঢেঁকিশালে, ছিটকে-পড়া ধান-চাল খুঁটে খুঁটে খায়। পূর্ণর মা রে-রে করে ওঠেন: জাতধর্ম কিছু রইল না, বাস উঠিয়ে তবে ছাড়বে ওরা। খোরশেদের বউ বেকুব হয়ে ছুটে এসে মুরগি তাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে তোলে। আবার কালীপুজোয় সন্ধ্যা থেকে পূর্ণর কালীঘরে একসঙ্গে চারটে ঢাক ড্যাডাং-ড্যাডাং করে। দু-কানে হাত চাপা দিয়ে খোরশেদ আর পাঁচজন মাতব্বর ডেকে বলে, টাকা হয়েছে কিনা, ঢাকে কাঠি দিয়ে মেজকর্তা সেইটে জানান দিচ্ছে। আর চলে না, বাস্তুভিটে ছাড়তে হল এবার। তোমরা কেউ যদি পাঁচ-দশ কাঠা ভূঁই দাও, ঘরের চাল খুলে নিয়ে সেইখানে চেপে পড়ি।

এমনই চলছে আজ আট-দশ বছর। বাস তোলে না কেউ। রাগের মাথায় বলে, পরক্ষণে ভুলে যায়। কিন্তু এবারে তা নয়। বাস সত্যি সত্যি তুলতে হবে। পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের কথাবার্তা উঠতেই যা কাণ্ড, হয়ে গেলে তো এক পক্ষ অন্য পক্ষকে কেটে কুচি

কুচি করবে। তবে কোন পক্ষ কাদের কাটবে, সেই হল কথা। অন্যান্য জায়গা সম্পর্কে লোকে যা হোক একটা আন্দাজ করে নিয়েছে—কিন্তু এই খুলনা জেলাটার ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। একদিন শোনা গেল, হিন্দুস্থানে দিয়ে দিয়েছে—যেহেতু গুণতিতে হিন্দু বেশি এ-জেলায়। মুসলমানের মধ্যে সাজ-সাজ পড়ে যায়ঃ কোন্ দিকে নৌকা ভাসাবে—ফরিদপুর না বাখরগঞ্জ? পরের দিন আবার উল্টো খবরঃ খুলনা দিয়েছে পাকিস্তানে। কলকাতা যাবার পর নদী-সমুদ্র-সুন্দরবন ও ব্যাপার-বাণিজ্যের এলাকাটাও যদি চলে যায়, পূর্ব-পাকিস্তানের রইল তবে কি? সেই বিবেচনায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। হিন্দুর মুখ শুকনো। শলা-পরামর্শঃ কোথাকার টিকিট কাটবে—বনগাঁ-দত্তপুকুর, না আরও এগিয়ে একেবারে খাস কলকাতা?

পাকা খবর আসে আসে—আসে না। বাইরে কিন্তু যেমন তেমনি। পূর্ণ সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা হল খোরশেদ খাঁর—

সেলাম আলেকুম মেজকর্তা।

সুখে থাক।

দেখা হলেই সেলাম এবং সুখে থাকার আশীর্বাদ চিরদিনের। তুই মুখের হাসি পর্যন্ত ঠিক যেমনধারা হয়ে আসছে।

পূর্ণ জিজ্ঞাসা করেন, ছেলের সাদি কবে দিচ্ছ খোরশেদ?

এ মাসে হল না, সেই অঘ্রানে। হলে কি আর জানবে না? তদ্দিন অবিশ্যি থাক যদি তোমরা।

থাকব না তো কোথায় যাব? সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে বুড়ো-বয়সে কোন চুলোয় যাব মরতে?

কী সর্বনাশ, টের পেয়ে গেল নাকি? সশঙ্কিত পূর্ণ সমাদ্দার ভাবছেন, চর এসে নিশ্চয় কিছু শুনে গেছে। আরও সতর্ক হয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। আরও গভীর রাত্রে। বাড়ির ছেলেপুলেকেও বিশ্বাস নেই তারা ঘুমিয়ে গেলে তার পরে।

রাত-দুপুরে বিরাশি বছরের বুড়া দ্বারিক হালদার আসেন লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে। নৃপতি সেন আসেন। হাজরা মজুমদার ও অধীর সাহা আসে।

নৃপতি বলে, জায়গাজমি দেখে এলাম ইছামতীর ওপারে। বেতের জঙ্গল, বুনোশূয়োরের আস্তানা—সেইসব জায়গার এখন কাঠা হিসাবে দর হাঁকছে। কারো সর্বনাশ, কারো পৌষমাস—বেটাদের চক্ষুপর্দা নেই।

দ্বারিক ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললেন: দেখ, অন্তিমে গঙ্গাপ্রাপ্তি চাই নি কখনো। বাপঠাকুর্দা মুজগন্নির শ্মশানে গেছেন—বুড়ো হাড় ক'খানা ভেবেছিলাম তাঁদের জায়গায় নিয়ে গিয়ে পোড়াবে। কিন্তু ভবিতব্য আলাদা। কোথায় কোন আদাড়ে-ভাগাড়ে মরে থাকব, শিয়াল-শকুনে টেনে খাবে।

পূর্ণ ভিতর দিকে বাঁধাছাঁদায় ব্যস্ত ছিলেন। তামাক সেজে নিয়ে এসে এঁদের হুঁকোয় বসিয়ে দিলেন। তারপর দ্বারিক ও নৃপতিকে গড় হয়ে প্রণাম করলেন।

দ্বারিকের চোখ ছলছল করে: চললে তা হলে?

হ্যাঁ খুড়োমশায়। পাকিস্তান হয়ে গেলে তখন আর যাওয়ার পথ থাকবে না। আনসার-বাহিনী এখনই তড়পে বেড়াচ্ছে। বিরাটিতে মাসতুত ভাই আছে। সে খবর পাঠিয়েছে, গিয়ে পড়লে যা-হোক একটা ব্যবস্থা হবে। চিঠি ছুঁড়ে জায়গা-জমি হয় না।

নৃপতি বলেন, যাও চলে সহায় পেয়েছ যখন। কখন যাচ্ছ?

দিনমানে সকলেব চোখের সামনে পারব না। আজ সারারাত গোছগাছ করে রাখি, রওনা কাল রাত্রে। হয়তো এটা হিন্দুস্থানেই থেকে যাবে। তখন ফিরে আসব। ঘরদোর তো বেচে দিয়ে যাচ্ছি নে, কী বলেন?

হাজরা মজুমদার নিজের চিন্তায় মগ্ন আছে একপাশে। পূর্ণ তার হাত দু-খানা জড়িয়ে ধরলেন: কাঁঠালগাছ নিয়ে দু-বছর মামলা

করেছি তোমার সঙ্গে। দোষ-অপরাধ মনে রেখ না হাজরা-ভাই। বাগান-ভরা আম-কাঁঠাল, পুকুর-ভরা মাছ—নিয়েথুয়ে খেও সমস্ত। আজেবাজে মানুষের বদলে তোমরা স্বজাত যদি খাও, অনেক শান্তি।

সেই সময়টা ওদিকেও বাঁশবন ছাড়িয়ে খোরশেদ খাঁর দলিচঘরে মাতব্বরদের বৈঠক বসেছে। সর্বনেশে কাণ্ড! সামাদ গাজি স্বকর্ণে শুনে এসে তবে বলছে। বিলপারের নমোরা তৈরি—লাঠিতে তেল মাখাচ্ছে, নতুন হাঁড়িতে ঘষে ঘষে শড়কি চকচকে করছে। খুলনা হিন্দুস্থানে—এই খবরটুকুর জন্য শুধু অপেক্ষা। হুড়মুড় করে এসে পড়ে মেরেধরে ঘর জ্বালিয়ে সমভূমি করে যাবে।

কথার মাঝখানে খোরশেদ খাঁ পূর্ণর বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে সতর্ক করে দেয়ঃ আস্তে ভাই, শব্দ কোরো না। দুষমন ওখানে। শলা-পরামর্শ করছি—টের পেলে এক্ষুনি বিলপারে খবর দিয়ে দেবে। ফরমান আসা অবধি সবুর করবে না।

সামাদ বলে, ফরমানে যা-ই আসুক, আমি এখন বরিশালে নানার বাড়ি গিয়ে থাকিগে। হিন্দুস্থান হয়ে গেলে কোন বেটাকে তখন আর গাঙ পার হতে দেবে না।

খোরশেদ বলে, কিন্তু তোর ক্ষেত নিড়ানোর কী? এমন খাসা ধান হয়েছে—নিড়ানো না হলে ঘাসবনে বরবাদ করে দেবে।

সামাদ বলে, খোদাতালার উপর ফেলে যাচ্ছি। জানে বাঁচলে তবে তো ধান!

সকালবেলা সমাদ্দার-বাড়ির বাচ্চা ছেলে নন্তু বাঁশতলায় এসে খোরশেদের ছোট মেয়েটাকে চাপা গলায় ডাকছে, এই হাসনা, শোন্—

হাসনা এল। নন্তুর হাতে গুলতি আর রামসীতার মস্তবড় মাটির পুতুল।

কাছে আয়, একটা কথা বলি। অন্য কাউকে বলবি নে। খবরদার!

গোপন কথা শোনবার জন্য হাসনা ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল: কাউকে বলব না।

আজ রাত্রে গাঁ ছেড়ে আমরা চলে যাচ্ছি।

হাসনা অবাক হয়ে বলে, কেন রে?

থাকলে মোসলমানে মেরে ফেলবে। বাবা দ্বারিক-দাদু সব বলাবলি করছিল। আমি শুনে নিয়েছি।

হাসনা অপ্রত্যয়ের ভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, দূর! মারবে তো হিঁদুতে। আব্বা বলছিল মা'র কাছে। আমি তখন শুনেছি।

নন্তু বলে, মিথ্যে কথা। তোর শোনা ভুল—

দু-রকমও হতে পারে।—একটু ভেবে নিয়ে হাসনা জোর দিয়ে বলে, ঠিক তাই। বাঘে মারে, আবার কুমিরেও তো মারে। মোসলমান মারে বলে হিঁদু বুঝি মারতে পারে না? আচ্ছা, হিঁদু কেমন রে নন্তু—তুই দেখেছিস?

নন্তু বলে, কী বোকা রে! দেখলেই তো মেরে ফেলবে।

মোসলমান? মানে, বেটাছেলে—নানান জায়গায় যাস কিনা তুই!

সে-ও তো এক কথাই হল। কিছু দেখি নি। বাবা রে, না দেখতে হয় যেন কখনো!

তারপরে যে জন্যে নন্তু এই সাত-সকালে চলে এসেছে। বলে, এই পুতুল আর গুলতি তোকে দিলাম হাসনা। বাবা নিতে দিচ্ছে না, জিনিসপত্তোর অনেক হয়ে গেল কিনা।

পুলকিত হাসনা দু-হাতে নিয়ে নিল। বলে, দাঁড়া একটু নন্তু, রেখে আসি। সাঁ করে দৌড় দিল। ফিরে এসেছে জলছবি নিয়ে। বলে, দোরে বেচতে এসেছিল, দু-আনার কিনলাম। তা নাকি হিঁদুর ঠাকুর সব। আব্বা খাতার পাতায় মারতে দেবে না। তোকে দিলাম নন্তু। সেরে সামলে রাখিস, বাড়ির কাউকে দেখাস নে। দেখতে পেলে বকবে।

উপকার বিফলে যায় না

চাকরির খোঁজ এল। নাম-করা ফার্মের রিসেপসনিস্ট। বিদেশি কোম্পানি, মাইনে খারাপ দেবে না। খাটনিও কিছু নয়—সাজগোজ করে বসে থাকা, আর মিষ্টিকথা বলা আগন্তুকের সঙ্গে। কাজ কিছু কর আর না কর, মুখের হাসিটা চাই।

খোঁজ এনে দিল উর্মির বান্ধবী অলকা। টাইপিস্ট সে ঐ অফিসের। উর্মি বলে, ওই তো সবচেয়ে কঠিন কাজ আমার কাছে। হাসতে ভুলে গেছি। কটু বিষে মন জ্বলে, মিষ্টিকথা ঠোঁটে আনব কি করে? আর সাজগোজের কথা বলছিস, রূপ থাকলে তবে তো সাজ! একটু-আধটু যা আমার ছিল, পুড়েজ্বলে গেছে। সাজ তোকেই মানায়।

দাগা পেয়েছে জীবনে, আপনজন পেলে এমনিধারা বকবক করে। দরখাস্ত একেবারে টাইপ করে নিয়ে এসেছে অলকা। তাড়া দিয়ে উঠল: সই করতে বলছি, তাই কর। রূপের জন্য আজকাল বিধাতার মুখ চাইতে হয় না। নানান রকম জিনিস বেরিয়েছে বাজারে—নিজেরাই রূপ বানিয়ে নিতে পারি। ডাকুক ইণ্টারভিউয়ে। আমি সেদিন এসে সাজগোজ করে দেব।

ইণ্টারভিউয়ের দিন—উঃ, এত সুন্দর সুন্দর মেয়ে বেকার! হলঘর ভরে গেছে। সেক্রেটারি শহরে নেই, শোনা গেল এ্যাসিস্টাণ্টের উপর ভার, জনপাঁচেক তিনি বাছাই করে রাখবেন। সাহেব দিল্লি থেকে ফিরে তাদের ভিতর থেকে নিয়ে নেবেন। কিন্তু কোন বিচারে কাকে যে বাদ দেবে, উর্মি ভেবে পায় না। যার দিকে তাকায়, নজর ফেরে না। কী উজ্জ্বল! কথাবার্তায় ও চালচলনে বিদ্যুতের চমক। আগে বুঝতে পারে নি, কখনো তাহলে এমন প্রতিযোগিতায় আসত না।

একে একে ডাক পড়ছে, ইণ্টারভিউ হয়ে ভিন্ন দরজায় বেরিয়ে যাচ্ছে তারা। আরম্ভ হয়েছে ঠিক এগারটায়। দেড়টায় একঝোঁক বন্ধ হয়ে আড়াইটা থেকে আবার চলছে। এখন চারটে বাজে, উর্মিকে তবু ডাকে না। এরই মধ্যে আলমারির কাচে একবার নিজের প্রতিবিম্ব দেখল। সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ! অলকা যথাসাধ্য সাজিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই পাঁচ ঘণ্টায় রূপের গুঁড়ো ঝরে গিয়ে আদি চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। এ চাকরিতে চেহারাই হল আসল—সরে পড়বে নাকি টিপিটিপি? কিন্তু পুল থেকে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়া অথবা রেলের পাটিতে মাথা রেখে শুয়ে পড়া ছাড়া আর যে কোন নিশ্চিন্ত জায়গা মনে পড়ে না।

অবশেষে ডাক এল। নাগেশ নয়? নাগেশ এই ফার্মে এসে জুটেছে, সে ইণ্টারভিউ নিচ্ছে। হায় বিধাতা! ক্ষীণতম আশাটুকুও ফুস করে এক লহমায় নিভে গেল। কামরার মধ্যে সে আর নাগেশ। কড়া কিছু বচন শোনাবে বিদায় করবার আগে? টাকা ফেরত চাইবে দশ বছরের সুদ সমেত?

একটি পলক। পলকের মধ্যে দশটা বছর পিছিয়ে চলে যায়। নাগেশ পাগল তখন উর্মিকে নিয়ে। শত কাজ ফেলে গেটে দাঁড়িয়ে থাকে অফিসের ছুটির সময়টা। দু-জনে বেরিয়ে পড়ে। অনেক দূর চলে যায়—এক একদিন সেই ঘুঘুডাঙার বাগানে। কোন বড়লোক বাগান-বাড়ি বানিয়েছিল। এখন সাপ-শিয়ালের আস্তানা। কিন্তু পুকুরঘাটের ভাঙা চাতালের উপর পা ছড়িয়ে বসে দু-জনে চিনাবাদাম খাবার পক্ষে জায়গাটা উপাদেয়। নাগেশ এম. এ. পাশ করে এক কলেজ ঢুকেছে। প্রিন্সিপ্যাল আপন মামা। তাঁরই জোগাড়ে ঢুকতে পেরেছে। অধ্যাপনার কাজ—টাকাকড়ি না হোক, অতিশয় সাধুবৃত্তি। খাতিরসম্মান খুব।

নাগেশ গড়গড় করে ভবিষ্যতের সুখ-শান্তির কথা বলে, বাদাম

খেতে খেতে ঊর্মি হুঁ-হাঁ দিয়ে যায়। একদিন দেখা গেল ঊর্মির মুখ ভার। হাসে না, কথা বলে না। জোর করে মুখের আঁচল সরাতে গেল তো চোখে জল।

কি—কি হয়েছে?

বলবে না কিছু। নাগেশও নাছোড়বান্দা। যা কোনদিন করে না—আবেগের মাথায় হাত ধরে বসল ঊর্মির।

অগত্যা বলতে হয়। মেজবউদিরা বড়লোক। সত্যিকার বউদি নয়, প্রতিবেশী। তাঁর জড়োয়া নেকলেশ পরে বিয়েবাড়ি গিয়েছিল। নেকলেশ চুরি গেছে। স্বার্থপর জঘন্য মেয়েমানুষ মেজবউদি। স্বামীটাও গোঁয়ারগোবিন্দ। গয়না ফেরত না পেলে রক্ষে রাখবে না।

আত্মহত্যা করতে না হয়। তাছাড়া আর উপায় দেখি নে।

আজকের দিনটা ঊর্মি যা-হোক বলে ঠেকিয়ে এসেছে: নেকলেশ বাক্সের ভিতর, বাক্সের চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। নেকলেশ হারানোর কথা বলতে সাহস হয় নি, বলেছে চাবি হারিয়েছে। মেজবউদি সন্দেহ করেছে তবু। আজকের ভিতর চাবি পাওয়া না গেলে তালা ভেঙে বের করে দিতে হবে। সকালবেলা গয়না তার চাই-ই।

ঊর্মি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

নাগেশ ত্রস্ত হয়ে বলে, চোরে নিয়েছে, কোথায় এখন চোর খুঁজে বেড়াব? সোজাসুজি বরঞ্চ দামের কথা বলে দেখ।

ঊর্মি বলে, পাঁচ-শ টাকায় সেদিন মাত্র কিনেছে। আমি সঙ্গে ছিলাম। টাকাটা পেলে হয়তো ঠাণ্ডা হবে। কিন্তু মাসের শেষে এখন পাঁচ-শ কি—পাঁচটা টাকাও তো জোটানো দায়।

নাগেশ একটুখানি ভেবে বলে, কালকের দিনটাও সময় নিয়ে নাও—সন্ধ্যা অবধি। আমি আসব এমনি সময়ে।

ঊর্মির জল-ভরা চোখে চিকচিকে হাসি। কত ভাল ঊর্মি! অনেক রাতে নাগেশ বাসায় ফিরল। তখন সে নিশ্চিত বুঝেছে,

উর্মি আত্মহত্যা করলে তাকেও পিছন পিছন যমালয় অবধি ধাওয়া করতে হবে।

পরের দিন এক-শ টাকার পাঁচখানা নোট এনে উর্মির হাতে দিল। উর্মি বলে, যাই, মুখের উপর ছুঁড়ে দিইগে মেজবউদির। সবুর সইছে না। কী কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে! সংসারে টাকাটাই চিনেছে কেবল, টাকা ছাড়া আর কিছু জানে না।

নাগেশ অন্যমনস্ক। এক কথার জবাবে অন্য কথা বলে বসে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ায়ঃ আজকে যাচ্ছি। হাঙ্গামাটা মিটল কিনা, তার জন্য মন ব্যস্ত থাকবে।

উর্মি হেসে গলে পড়ছে। বলে, কাল নয়, পরশুও নয়—তুটো দিন কামাই করব। শুক্রবারে এস তুমি নাগেশ। নিশ্চয় এস। তোমার এত বড় ঋণ কেমন করে শোধ হবে, তাই ভাবছি।

ম্লান হেসে নাগেশ বলে, ভাল করে ভেবে এস এই তুটো দিনে। সাধুফকির আমি নই—শোধ চাই নে, প্রাণ ধরে এমন কথা বলতে পারব না।

শুক্রবারে গিয়েছিল নাগেশ। সেদিনও উর্মি অফিস করে নি। তখন চলে গেল বাগানবাড়ি—তাদের সেই ভাঙা চাতালে। সেখানে যদি আসে। মশাও যেন মতলব করে দলবদ্ধ হয়ে লেগেছে। গির্জার ঘড়িতে দশটা বাজলে হুঁশ হল, যুবতী মেয়ে আর আসতে পারে না।

তারপরে বিষম বিপাক। য়্যুনিভার্সিটি পরীক্ষার ফরম পূরণ করিয়ে ফী নেবার ভার নাগেশের উপর। তার মধ্যে ঐ পাঁচ-শ টাকা জমা দেয় নি। বন্ধুবান্ধবের কাছে হাওলাত-বরাত করে শেষ তারিখের মধ্যে দিয়ে দেবে ভেবেছিল। উর্মি আত্মহত্যার কথা বলে —ভাবনার কিছু ছিলও না তার উপরে। কিন্তু হাওলাত কেউ দিল না। কমিটির কানে উঠল। অধ্যাপক মানুষের পক্ষে সাংঘাতিক অপরাধ। প্রিন্সিপ্যাল মাতুল মশায় টাকাটা নিজে থেকে দিয়ে কোনরকমে আদালতের অপমান থেকে বাঁচালেন। চাকরি গেল।

এর মধ্যেও নাগেশ অনেকবার ঊর্মির অফিসের গেটে এসে দাঁড়িয়েছে। শেষটা একদিন ভিতরে ঢুকে গেল। চাকরিটা পাকা নয়; তার উপরে বিনা খবরে মাসদেড়েক একটানা কামাই—ধরে নেওয়া যেতে পারে, নেই তার চাকরি। বাড়ির ঠিকানাও জানা গেল না। দারুণ অভাবের মধ্যে ছিল—নাগেশ কতবার ভেবেছে, সত্যি সত্যি আত্মহত্যাই করল বা! কতদিন নিশ্বাস ফেলেছে!

আসলে কিন্তু নাগেশের মুখোমুখি হবার ভয়। পাছে দেখা হয়ে যায়, সেই ভয়ে ঊর্মি অফিস কামাই করত। পাঁচ-শ টাকা নিয়ে সেদিন সোজা সে গেল হিরণ্ময়ের কাছে। বিলাত যাবে হিরণ্ময় বিজনেস-ম্যানেজমেণ্টের ডিপ্লোমা নিতে। চিঠিপত্র লিখে ভর্তি হয়েছে। পাশপোর্ট তৈরি। গিয়ে পড়লে ইণ্ডিয়া-হাউসে ধরে পেড়ে কাজ একটা জুটিয়ে নেবেই। সে আত্মবিশ্বাস আছে। মুশকিল, জাহাজ-ভাড়ার জোগাড় হচ্ছে না।

তাই একদিন নিশ্বাস ফেলে বলল, কেরানিগিরিতে জীবন কাটবে। বুড়ো বয়সে দেড়-শ টাকা। ঘরসংসার-স্ত্রী-পুত্র অদৃষ্টে নেই। একলা উপোস করতে পারি, কিন্তু উপোসের ভাগ নেবার জন্য অন্যকে আনি কোন বিবেচনায়?

তারপর ঊর্মি টাকা এনে দিল। হিরণ্ময় অবাক হয়ে বলে, দিচ্ছ আমায়?

ঊর্মি বলে, তুমি চাইলে প্রাণ অবধি দিয়ে দিতে পারি। এ তো কয়েকটা টাকা।

হিরণ্ময় গদগদ হয়ে বলে, টাকা নয়। দু-জনে আমরা স্বর্গ রচনা করব, সেখানে উঠবার সিঁড়ি।

আবার বলে, আশার অতীত এনে দিলে তুমি। তবু হয় না। আমি অপদার্থ—দু-শ মাত্র জোটাতে পেরেছি। বেশি হবে কোথা থেকে? মাস গেলে যে ক'টি টাকা দেয়, তোমার কাছেও তা বলতে পারি নে। বিদেশ-বিভূঁয়ে শূন্য হাতে ওঠা যায় না। একটি

হাজার অন্তত। তোমার টাকা এখন রেখে দাও ঊর্মি। এই সেসানে হবে না। পরের সেসানে ছ-মাস পরে তখন চেষ্টা করব।

আবার ছ-মাস ? রক্ষে কর—

ঊর্মি টিপিটিপি হাসছিল এতক্ষণ। আঁচলের তলা থেকে গয়নার কৌটা বের করল। বলে, এটা বেচলে শ-চারেক হয়ে যাবে।

নেকলেশ। হিরণ্ময় অবাক হয়ে বলে, এমন জিনিসটা পরতে কোনদিন তো দেখলাম না।

আনকোরা নতুন দেখছ না ? একজনে উপহার দিল আমায়।

সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে হেসে ওঠে : না গো, মুখ ভারী করতে হবে না। কে আমায় দিতে যাবে! যা-কিছু দেবার তুমিই দিও বিলেত থেকে ফিরে এসে। নেকলেশ মেজবউদির। পছন্দ করে নতুন কিনেছে। মামাতো বোনের বিয়েয় আমি পরে গেলাম। নিপাট ভালমানুষ মেজবউদি, মেজদাও তেমনি। মানে নিরেট বোকা। হারিয়ে গেছে বলতে অমনি তাই বুঝে নিল।

হিরণ্ময় ইতস্তত করে। বলে, চুরি করা হল যে!

ঊর্মি সায় দেয় : তা সত্যি। চোর আমি তোমারই জন্যে। মেজবউদির কাছে পাপী হয়ে রইলাম। ফিরে এসে তুমি পাপ মোচন করে দিও।

ঘাড় নেড়ে হিরণ্ময় বলে, নিশ্চয় করব। তখন এ দুঃসময় থাকবে না। কোন একটা অজুহাত করে বউদিদিকে নেকলেশ গড়িয়ে দেব। ডবল দামের নেকলেশ।

দু-জনে সামনাসামনি বসে কত গল্প! দেড় বছর কি বড় জোর দুটো বছর—দেখতে দেখতে কেটে যাবে। বম্বে পৌঁছেই চিঠি দেব। এডেন থেকে আর একটা, আলেকজাণ্ড্রিয়ায় গিয়ে আবার। জেনোয়ায় পৌঁছে মস্তবড় খামের চিঠি। সারা পথ চিঠি ছাড়তে ছাড়তে যাব ঊর্মি।

কিন্তু একটা চিঠিও আসে নি দশ বছরের ভিতর। একটা

খবরও নয়। নাগেশের সামনে দাঁড়িয়ে পলকের মধ্যে পুরানো কথা মনের উপর তরঙ্গ খেলে যায়। নাগেশ একদৃষ্টে তাকিয়ে। ভাল করে চিনে নিচ্ছে। এতকাল পরে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে—হুঙ্কার দিয়ে উঠবে? কিংবা ঘৃণায় কথা না বলে বেরিয়ে যাবার দরজা দেখবে?

অতি সহজভাবে নাগেশ বলল, বসুন। (শোন, উর্মিকে আপনি বলে আজ নাগেশ!) উর্মির দরখাস্তটা দেখে খসখস করে কি লিখে যাচ্ছে ফাইলের পৃষ্ঠায়। মুখ তুলে তারপর বলে, বাঁ-দিককার ঘরে গিয়ে বসুন। খবরটা জেনে যান একেবারে। মিনিট পনেরোর ভিতর নাম পাঠাব।

অতএব সেই ঘরে গেল উর্মি। আরও সব আছে, নাগেশের নিন্দেমন্দ করছে তারা: বিশ্বসংসারের যাবতীয় প্রশ্ন—জবাব নিজেই বড় জানে কিনা! সুযোগ পেয়েছে তো বিদ্যে ফলাতে ছাড়বে কেন? কিন্তু উর্মিকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করে নি নাগেশ। 'আগে দর্শনধারী, তারপরে গুণ বিচারি'—নজরে দেখেই হয়তো প্রশ্ন করা বাহুল্য মনে করেছে।

কেরানিবাবু এসে নাম পড়ছেন। কী আশ্চর্য, কানে শুনেও বিশ্বাস হয় না—প্রথম নাম উর্মি।

বড় দোকানের কাচের জানলায় উর্মি ঘুরে ঘুরে সাজানো জিনিস-পত্র দেখছে। নাগেশ বেরিয়ে আসতে দ্রুতপদে কাছে গেল।

আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। লিস্টে আমার নাম দিয়েছেন।

নাগেশ বলে, সকলের উপরে।

কী যে উপকার করলেন আমার!

ট্রাম ধরতে যাচ্ছিল নাগেশ। থমকে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে সহজভাবে বলে, কিছু না, কিছু না। এ নামটা না দিয়ে ওই নাম

বসানো। কিন্তু সেবারের উপকারের ধাক্কায় শ্রীঘরে নিয়ে তুলছিল। মামা বাঁচিয়ে দিলেন। সে যাকগে। শেষরক্ষা হলে হয়। কড়া সাহেব আমাদের সেক্রেটারি। ভাল উচ্চারণে ইংরেজিতে তড়িঘড়ি জবাব দেবেন। তবু কী হয় বলতে পারি নে। আচ্ছা—

তড়াক করে লাফিয়ে সে চলতি ট্রামে উঠে পড়ল।

দিন দশেক পরে সেই মোক্ষম পরীক্ষা। সেক্রেটারি সাহেবের খাসকামরায়। দরজা-জানলা-আঁটা এয়ারকণ্ডিসণ্ড ঘর। কিন্তু ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যেই কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। দুটো ইংরেজি কথা পাশাপাশি জুড়তে জিভ জড়িয়ে যায়, কী ইংরেজি জবাব দেবে সাহেব মানুষের কাছে!

সাহেব আঙুল তুলে চেয়ার দেখিয়ে দেয়। চেয়ার কী—যেন জলহস্তী হাঁ করে আছে। গদির মধ্যে চক্ষের পলকে তাকে গিলে খেয়ে ফেলল।

সাহেব মানুষ ঊর্মিকে অবাক করে দিয়ে বাংলা কথা বলে ওঠে: চাকরি আপনারই হবে। ওই চারজনকে ডেকে এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করে বাতিল করে দেব। মিনিট দুয়েক বসে যান। ভয়ানক রকমের পরীক্ষা দিচ্ছেন, বাইরের ওরা ভাবুক।

হাসল একটু ঠোঁটের হাসি। আর চিনতে বাকি থাকবে কেন? হিরণ্ময় পুরাদস্তুর সাহেব এখন, এবং এত বড় ফার্মের সেক্রেটারি। হঠাৎ ঊর্মির পুরানো নীতিবাক্য মনে আসে: উপকার কদাপি বিফলে যায় না। হিরণ্ময়ের বিলাত যাওয়ায় সাহায্য করেছিল—ফল এই দশ বছর পরে।

চাকরির প্রথম দিন নাগেশ এক সময়ে ঊর্মির টেবিলে হাজির।

অভিনন্দন জানাতে এলাম।

আপনিই তো এর মূলে।

হেন ক্ষেত্রে না-না—বলে বিনয় দেখানো রীতি। নাগেশের তা নয়। ঘাড় নেড়ে সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, তা ঠিক। গোড়াতেই যদি ঝেড়ে ফেলতাম—সে ক্ষমতা ছিল আমার—তা হলে সাহেব অবধি পৌঁছতে হত না। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় আসছে না—

ঊর্মি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

নাগেশ বলে, মাইনে দেড়-শ বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। কলমের খোঁচায় সাহেব আড়াই-শ করে দিলেন। উনি যা করবেন, ডিরেক্টররা চোখ বুঁজে মেনে নেবে। কিন্তু এমন কখনও হয় না। কোম্পানির টাকা ওঁরই যেন বুকের পাঁজরা। এইবারে কেবল এই আপনার বেলা দেখছি—

ঊর্মি কৌতুক-দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, কী মনে হয় আপনার ?

আগের জানাশোনা নাকি ?

আমার কাছে উপকার পেয়েছিলেন এক সময়ে।

দেখলেন ? নাগেশ বিগলিত হয়ে উঠল : মানুষ এমনি-এমনি বড় হয় না। ওর জন্যে কবে কী করেছিলেন, মনের মধ্যে গেঁথে রেখে এতদিনে তার শোধ দিলেন।

একটু থেমে ঢোঁক গিলে নিয়ে বলে, উপকার আমিও তো করি। উপকারের দায়ে সেবারে ধরুন জেলে যেতে বসেছিলাম।

বুকের মধ্যে দুলে ওঠে ঊর্মির। বছর দশেক আগে দুজনাই কমবয়সি—সেই আমলের কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পায়। বলে, কী করতে পারি বলুন। প্রাণ দিয়েও আপনার ঋণের যদি শোধ হয়—

নাগেশ ইতস্তত করে : প্রাণ কেন দিতে হবে ? মানে—

ঊর্মি অধীর কণ্ঠে বলে, বলুন না—

দেখুন, ফার্স্ট ক্লাস এম. এ. আমি। পাঁচ বছর পড়ে আছি, মাইনে কুল্যে এক-শ আশি। অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা, কুলিয়ে ওঠা যায় না। সাহেবকে যদি বলেন একটু আমার কথা। মানে, এক্ষুনি নয়, ধীরেসুস্থে সময় বুঝে—

একটুখানি স্তব্ধ থেকে উর্মি হাসল: সে কী কথা! নিশ্চয় বলব। উপকার বিফল হয় না। আমার বেলা হয় নি, আপনারই বা হবে কেন?

হিরণ্ময়কে বলবে কি না বলবে, সে হল পরের ভাবনা। রিসেপসনিস্ট মেয়ে—হাসতে হবে। সেজেগুজে হেসে হেসে মিষ্টিকথা বলা তার চাকরি। এই পয়লা দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল।

পার্থপ্রতিম

সতীদাহ আমলের গল্প। সতীকে বোঝানো হচ্ছে: আগুনে বিষম কষ্ট, সে কষ্টের আন্দাজ নেই তোমার। সতী নিরুত্তরে ঘৃত-প্রদীপটা টেনে নিয়ে তার উপরে হাত রাখলেন। চামড়া পোড়ার উৎকট গন্ধ। সতী কিন্তু তাকিয়েও দেখেন না। হাসিমুখে অন্য হাতে কোলের শিশুটার গায়ে-মাথায় হাত বুলাচ্ছেন।

গল্প পড়ে পার্থ লাফিয়ে ওঠে। এই পথ। একালে সতীদাহ উঠে গেছে, কিন্তু মোটামুটি রেওয়াজটা রয়েছে। সর্বদেহে ন্যাকড়া জড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে আগুন ধরানো। মেয়েরাই করেন। শক্ত করে ন্যাকড়া জড়াতে পারলে ফল অব্যর্থ। নিভানোর জন্য যত দাপাদাপি কর, আগুন ততই লকলক করে উঠবে। আত্মীয়স্বজনের দিক দিয়েও সন্তোষের কারণ আছে। মৃত্যুর পরে যা-কিছু করণীয়, মানুষটা নিজেই সব সমাধা করে যাচ্ছে। পোড়া-দেহটুকু কেবল শ্মশানের নদীগর্ভে দিয়ে আসা। বখেড়া প্রায় কিছুই নেই।

ভেবে-চিন্তে সে দু-পয়সার এক মোমবাতি কিনে আনে। প্রক্রিয়া আগে একটু পরখ করবে। চোখ বুঁজে দাঁতে-দাঁত চেপে কড়ে-আঙুলটা জ্বলন্ত বাতিতে ধরেছে। উ-হু-হু—কী জ্বলুনি রে বাবা! ফোসকা উঠে গেল দেখতে দেখতে। শুধুমাত্র কড়েআঙুলে এই

কষ্ট—আস্ত দেহখানা কী করে যে আগুনে দেয়! মেয়েরাই পারেন—কে বলে নারী অবলা!

আবার কয়েকটা দিন চুপচাপ। যথারীতি পার্থ দরখাস্ত ছেড়ে যাচ্ছে। দিবারাত্রি ফাইফরমাস খেটে মাসিমার কিছু মন ভিজিয়েছে। আপন মাসি নয়, একটা-কিছু বলে ডাকতে হয় তাই মাসি। মাসিমার বোন থাকেন ডুয়ার্স অঞ্চলে, ভগ্নিপতি আসাম-লিঙ্কের কোন স্টেশনে স্টেশনমাস্টার। মাসিমা তাঁদেরও লিখেছেন—পার্থকে কোন চা-বাগানের কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারেন যদি। এর উপরে আরও সদয় হয়ে বিকেলবেলা ছ-টা করে পয়সা বরাদ্দ করেছেন চা খেয়ে আসবার জন্য। দোকানে বসে পার্থ চা খায় এবং দোকানের খবরের কাগজে কর্মখালি দেখে দেখে ঠিকানা টোকে। সম্বল ক্রমশ প্রতিদিনের ঐ ছ'পয়সায় এসে ঠেকল। চা খাওয়া বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ঠিকানা টুকতে যায় এখন দোকানে। বড়-ঘরের ছেলে—সর্বস্ব গেছে, কিন্তু চেহারাটা রয়েছে। খদ্দের না হয়েও খুব খাতির। চায়ের পয়সায় ডাক-টিকিট কিনে দরখাস্ত ছাড়ছে। ফলের ইতরবিশেষ নেই। গীতায় নিষ্কাম কর্মযোগের কথা আছে—সেই মহাসাধনায় প্রার্থপ্রতিম বছর দেড়েক ধরে লেগে রয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন শ্মশানঘাটে গিয়ে পড়ল। মরণের পর নদীর কিনারে সম্ভবত এই বটের ছায়ায় এনে নামাবে। জীবনকালে এখনও গুঁড়ির উপরে চুপচাপ বসে থাকতে মন্দ লাগে না। নদী-শোভা দেখতে দেখতে আবার এক মতলব মাথায় আসে। আগুনে যন্ত্রণা বটে, কিন্তু নদীর ঠাণ্ডা জল অত্যন্ত আরামের।

সে রাত্রে থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা। কম্বলের নিচে থেকে উঠে পার্থ বেরিয়ে পড়ল। টনসিলের দোষ—ছাতা একটা না নিয়ে আসা ভুল হয়েছে। গায়ের র‍্যাপারটা গলায় জড়িয়ে নেয়, গলদেশ গরম থাকলে টনসিলে কায়দা করতে পারবে না। পুলের

উপর উঠে—কোন রকম ইতস্তত নয়—হাত-পা ছেড়ে ঝুপ করে জলে পড়ল।

কনকনে নদীজলে অসাড় হয়ে গিয়ে, ভেবেছিল, সোজা একেবারে পাতালপুরী। পাতালবাসিনী রাজকন্যার অতিথি—বেকার হওয়া সত্ত্বেও নিখরচায় ঘি-মাখন খাবে, দুধে আঁচাবে। ঠিক উল্টো। বাঁচবার উত্তেজনায় পলকের মধ্যে সর্বদেহে যেন আগুন ধরে গেল। কিশোর-বয়সে পূর্ববাংলায় তাদের সাগরগড়ের দীঘিতে কোণাকুণি কত পাড়ি দিয়েছে। সেই অসুরের শক্তি ফিরে আসে হঠাৎ। সাঁতার কেটে সে ডাঙায় উঠে পড়ল।

ডাঙায় উঠে শীতে কাঁপে, আর হায়-হায় করে মনে মনে। সাঁতার জানাটাই কাল হল। এক হতে পারত, গলায় কলসি বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু কপালখানা যে রকম—কলসিতে হয়তো জলই ঢুকল না। কিম্বা ঝাঁপ দেবার মুখে ভেঙে গেল কলসি! তা ছাড়া এই আধা-শহর জায়গায় দুর্যোগ যত বড়ই হোক, লোক-চলাচল একেবারে বন্ধ হয় না। একটা মানুষ আয়োজন করে গলায় কলসি বাঁধছে, মজা দেখতে ভিড় জমে যেত।

মোটের উপর হল না কিছুই—ভিজে ঢোল হয়ে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে পার্থ বাসায় ফিরল। আর যে ভয় ছিল—টনসিল বিগড়ে এখন থেকেই গলা খুশখুশ করছে। শেষরাত থেকে কাশি। মেসোমশায় উকিল মানুষ—ভোর থাকতে উঠে বইপত্র ঘেঁটে আরজির মুশাবিদা করেন। পাশেই কাছারিঘর, সেখান থেকে তিনি ক্ষেপে ওঠেন: আচ্ছা কেশোরোগির পাল্লায় পড়া গেল! কাজকর্ম করতে দেবে না। বলি, বিদায় হচ্ছ কবে? চাকরি হল না হল জানি নে, এই মাসের মধ্যে বাসা ছেড়ে চলে যাবে। আমার পাকা হুকুম। বাড়ির মধ্যে প্যানপ্যান করে হুকুমের রদ হবে না। এইটে জেনে রেখে দাও।

নতুন মাসের মাঝামাঝি এখন। হপ্তা দুয়েকের মতো সময় আছে। খবরের কাগজে পার্থ ইদানীং কেবল কর্মখালি দেখে না, দুর্ঘটনার কলমেও চোখ বুলায়। হালফিলের রকমারি আত্মহত্যার খবর। একটা জিনিস প্রায়ই চোখে পড়ে—ইঞ্জিনে কাটা পড়া। বিজ্ঞানের যুগে, মনে হচ্ছে, ইঞ্জিনের কদরটাই সকলের বেশি। বাসা থেকে পঞ্চাশ কদম গিয়েই রেললাইন। ছোট লাইন, ইঞ্জিনও ছোট —কিন্তু একটা মানুষ কাটা পড়ার পক্ষে যথেষ্ট। পদ্ধতিটা চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই।

অষুধপত্র খেয়ে কাশিটা কিছু আরাম হয়েছে। বৃষ্টি নেই সেদিন, কিন্তু আকাশ মেঘে থমথম করছে। বিষম অন্ধকার। জলকাদা মেখে পা টিপে টিপে বিস্তর কষ্টে পার্থ রাস্তার উঁচুতে উঠল। স্লিপারের উপর সটান শুয়ে পড়ল একদিককার পাটিতে মাথা রেখে। লাইনের ভিতর জল জমে আছে, পাটির নিচে জল বেরিয়ে যাবার নালাটুকু জঙ্গলে বুজে গেছে। কাজকর্ম কেউ কিছু করে নাকি আজকাল—সবাই ফাঁকিবাজ। এ যেন ক্ষীরোদ-সমুদ্রে নারায়ণের শয়নের মতো হল। কিন্তু নারায়ণ-দেবতা বলেই পারেন, পার্থ একবার শুয়ে তখনই উঠে পড়ল। লোহার পাটির উপর উবু হয়ে বসেছে। এসে পড়ুক ট্রেন, টুক করে সঙ্গে সঙ্গে সে শুয়ে পড়বে।

লাইনের এখানটা বাঁকচুর নেই, টানা সরলরেখা। ইঞ্জিনের আলো দেখা দিল দূরে। ছোট্ট আলো—নক্ষত্রের মতো। কাঁপছে, বড় হয়ে উঠছে। কাছে—আরও কাছে এসেছে, তীব্র আলোয় যেন দিনমান। প্রাগৈতিহাসিক কালের অতিকায় এক সরীসৃপ হুঙ্কার দিয়ে ধেয়ে আসছে। লাফ দিয়ে চক্ষের পলকে পার্থ লাইনের বাইরে এসে পড়ে। গড়াতে গড়াতে চলে যায় বর্ষার জলে ভরভরন্ত নয়ানজুলির ধারে গুড়িকচু-বন অবধি। গাড়ি হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল—তখন নিঃসংশয় হল বেঁচে আছে সে।

হার এবারও। শেষ মুহূর্তে কী রকমটা হয়ে যায়, এতকালের

কষ্টেস্বষ্টে লালন-করা দেহপ্রাণের উপর মমতা উথলে ওঠে। হাত দুটো নুলো এবং পা দু-খানা পঙ্গু হলেই রেলে কাটা চলে। শক্ত-সমর্থ মানুষ ইঞ্জিনের মুখে কেমন করে পড়ে থাকে, কে জানে। পার্থ অন্তত পারবে না।

মাস ওদিকে দ্রুত শেষ হয়ে আসে। কিন্তু ততদিনও সবুর সইল না। মেসোমশায় ডেকে পাঠালেন: শ্যালী-ভায়রাভাই সব এসে পড়ছেন। জায়গার অনটন বুঝতেই পারছ, তাড়াতাড়ি অন্য জায়গা খুঁজে নাও। দু-একদিনের মধ্যে।

ডুয়ার্সের স্টেশনমাস্টার পার্থকে কোথায় ডেকে পাঠাবেন—তা নয়, নিজেরা এসে উৎখাত করছেন তাকে। পুরানো ভৃত্য নীলমণির সঙ্গে সে একঘরে শোয়। রাত্রিবেলা ভাত হোক না হোক, আফিমের গুলি গোটা পাঁচেক চাই-ই নীলমণির। আফিমের পরে দুধ। না দিলে চুরি অথবা জবরদস্তি করে খাবে। তার পরে চোখ বুঁজে ঝিম হয়ে থাকে। শতমুখে সে আফিমের মাহাত্ম্য শোনায়। এমন নেশা ইন্দ্রলোকেও বুঝি নেই! উপকারও বিস্তর। সাপে কামড়ালে সাপই মরবে, নীলমণির কিছু হবে না। সইয়ে সইয়ে অশেষ যত্নে এই পাঁচ গুলি অবধি রপ্ত করেছে। অন্য যে-কেউ এই পরিমাণ মুখে পুবলে —ঐ যে চোখ বন্ধ করে বসে আছে, সে চোখ ইহজন্মে খুলবে না।

অতএব পার্থেরও পাঁচটা গুলি দরকার। তাড়াতাড়ি—মেসোমশায় যেমন ঐ হুকুম দিলেন, দু-চার দিনের মধ্যে। পাঁচ নয়, তার ডবল—দশটা। ডবল ডোজ চাপালে আরও নিশ্চিন্ত। জলের নিচে দম আটকে ছটফটানি কিম্বা ইঞ্জিনের চাকায় হাড়ে-মাসে মশলা-পেশা নয়, চোখ বুঁজে বুঁদ হয়ে নন্দনকাননে মনে মনে চরে বেড়ানো। কিন্তু মুশকিল হল, আফিমটা কেউ বিনামূল্যে দান করবে না—নগদ খরচার ব্যাপার। তারও জোগাড় হয়ে গেল অপ্রত্যাশিত ভাবে। কাছারি-

ঘরের মেজেয় একখানা দশটাকার নোট। ঈশ্বর সদয় এবারে—বোঝা যাচ্ছে, টাকাটা তিনিই জুটিয়ে এনে দিলেন।

আবগারির দোকানে ছুটল। পয়সা দিয়ে মাল কিনতে এত বখেড়া কে জানত! লোহার রডের অন্তরাল থেকে লোকটা হাত বাড়িয়ে বলে, লাইসেন্স? বিনি লাইসেন্সে চাংড়ামি করতে এসেছ—এইটুকু ছোকরা মৌতাতের অভাবে মরে যাচ্ছ একেবারে? পালা, পালা—দোকানের মধ্যে ঝামেলা করিস নে।

তাড়া খেয়ে মুখ চুন করে পার্থ বেরিয়ে আসে। আর একজন তার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েছে। সমবেদনার সুরে সে বলে, পাজি নেশা। ঠিক সময়ে না হলে জান যাবার দাখিল। ব্লাকে অবিশ্যি জোগাড় করা যায়। দুটো-চারটে পয়সা বেশি নেবে, কিন্তু পয়সা তো জীবনের চেয়ে বড় নয়।

ব্লাক কোন বস্তু, পার্থ প্রথমটা বুঝে উঠতে পারে না। লোকটা আরও অবাক: আকাশ থেকে পড়লে না বিলেত থেকে এলে? সাদা-বাজারের কাজকর্ম কতটুকু, ব্লাকেই তো চলছে আজকাল সব।

নিয়ে গেল সেই ব্লাকের জায়গায়। গরু-মহিষের খাটাল। মালিক নিজে আফিমখোর, পরহিতার্থেও কিছু কিছু রাখে। চেনা খদ্দের সব—তারা আফিম কেনে, আর অনুপান হিসাবে দুধ কিনে নেয়। আধ-ভরি মাল চাই—উঁহু, তার কমে হবে না। দশ টাকাই লেগে গেল। দমকা খরচ—যাকগে, এই সন্ধ্যেরাতটুকু কেটে গেলে কোনদিন কখনো আর আধলা পয়সার খরচা নেই।

শোবার মুখে দৃকপাত না করে সমস্তটুকু খেয়ে নিল। সামান্য তিতো, স্বাদ নিতান্ত খারাপ নয়। আলসে চোখ জড়িয়ে আসে। দুনিয়া খারাপ নয়, কিন্তু ফুলের মধ্যে পোকার মতন মানুষগুলো বেয়াড়া। মানুষের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেল এইবার। মৃত্যুর মুখে চোখ বুঁজে পার্থ এখনি কত কি ভাবছে....

মরে গেছে, এই অবধি জানা। সকালবেলা ধড়মড়িয়ে উঠল। রক্তচক্ষু মেসোমশায় দুর্দান্ত কিল ঝাড়ছেন: চোর শয়তান, মনের ভুলে নোটখানা ফেলে গিয়েছি, অমনি সেটা গাপ করেছ?

পার্থ হতভম্বের মতো চেয়ে থাকে। আস্তে আস্তে সব মনে পড়ে যায়। মরেই তো গিয়েছিল, মেসোমশায়ের কঠিন হাতের কিল মৃতসঞ্জীবনী হয়ে প্রাণ ফিরিয়ে আনল।

সজোরে ঘাড় নেড়ে বলে, আমি কেন নিতে যাব? আমি চক্ষেও দেখি নি।

মেসোমশায় আবার ধেয়ে আসেন তার দিকে: চুরি, তার উপরে মিথ্যেকথা! তুমি নাও নি—দশটাকার নোটের তবে পাখনা বেরিয়েছিল, পাখনা বের করে ফুরফুর করে উড়ে গেল? জেলে পাঠিয়ে তোমায় শিক্ষা দেব, সামান্য বলে ছেড়ে দেব না।

নীলমণিকে হুকুম করলেন: ঘরে নিয়ে পোর নীলমণি। শিকল দে বাইরে থেকে। না যেতে চায়, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবি। পুলিশ নিয়ে আসছি আমি।

ঐ যে জেলের কথা হল, তারপরে পার্থর অন্য-কিছু কানে ঢোকে না। তাড়িয়ে দিয়ে মেসোমশায় সঙ্গে সঙ্গে অমনি সুরাহা করে দিচ্ছেন। দালানে বসবাস, নিরখচায় খাওয়াদাওয়া—সদাশয় সরকার বাহাদুরের এমন পাকা বন্দোবস্ত থাকতে কেন আহাম্মুকের মতন মরতে যাচ্ছিল! কতদিন থাকতে দেবে তাই এখন ভাবনা। ছোট মামলা—কিন্তু দুঁদে ফৌজদারি উকিল মেসোমশায় চেষ্টা করে মেয়াদ কিছু বাড়াতে পারবেন না?

নীলমণি টেনে-হিঁচড়ে ঘরে পুরবে কি, পার্থ নিজেই ঢুকে পড়ে থানা-ওয়ালাদের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু কোথায় ছিলেন মাসি, হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়লেন: দশটা টাকা তো? আমি নিয়েছি—কী করবে কর। যাও কেন ফেলে? যেমন ফেলে যাও তেমনি।

সামুদ্রিক সর্বপ্রাণীর ত্রাস হল তিমি। শোনা যায়, আর এক

প্রাণী আছে—তিমিঙ্গিল, তিমি থরহরি কম্পমান তার ভয়ে; বাগে পেলে কোঁৎ করে আস্ত তিমি গিলে ফেলবে। মাসিমা হলেন তাই। দুর্ধর্ষ উকিল মেসোমশাই হুঁ-হুঁ করে অস্পষ্টভাবে কী সব বলে সুড়সুড় করে সরে পড়লেন।

এ সুযোগও ভেস্তে গেল অতএব। হায় মাসি, তোমার জন্য এত খেটে মরি—তুমিই শেষটা এই করলে! ইতিমধ্যে মাসিমা একবাটি গুড়মুড়ি এনে হাতে ঠেসে দিচ্ছেন: খাও—

সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে মোলায়েম কণ্ঠে বলেন, এবারে তোমার হয়ে যাবে উপায়। ছুটি নিয়ে জামাইবাবুরা এসে যাচ্ছেন। নমিতা সেয়ানা হয়ে পড়েছে, এখানে থেকে বিয়ের বন্দোবস্ত করবেন। অত দূরে থেকে হয় না। সামনাসামনি কথাবার্তা বলব। জামাইবাবু নিজেই এক চা-বাগান কিনেছেন। গোটা দুই ভাল স্টেশন পেয়ে ছিলেন, সেই সময়টা রোজগার করে নিয়েছেন। এখন বেনামিতে কিনে রাখলেন, রিটায়ার করবার পর চেপে বসবেন। তদ্দিন খাঁটিলোক চাই একজনা—

পোড়া-শোলমাছ শনিব প্রকোপে খলবল করে জলে পালিয়ে যায়। পার্থরও হয়েছে তাই, কোন-কিছুতে নির্ভর করতে পারে না এখন। জুয়াচোর খাটালওয়ালার উপর রাগে গরগর করছে। গালে চড় মেরে দশ দশটা টাকা নিয়ে নিল—অন্তত গোটাকয়েক শক্ত কথা না শুনিয়ে সোয়াস্তি পাচ্ছে না।

বিকালের দিকে এক সময় পার্থ বেরিয়ে পড়ল।

গাই দোওয়া হচ্ছে সামনের দিকে, রকমারি পাত্র হাতে নানান লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে। তাদের পাশ কাটিয়ে পার্থ সোজা খোপের মধ্যে মালিকের কাছে গিয়ে পড়ল।

কী আফিম দিয়েছিলে? সমস্তটা খেয়ে ফেললাম, দিব্যি তবু বেঁচে রয়েছি।

মালিক একগাল হেসে বলে, বাঁচবেন না কেন! বেঁচেবর্তে থেকে নেশাভাং আমোদ-ফুর্তি করুন, তুনিয়া ভোগ করে যান। কাঁচা বয়সে মরাছাড়ার কথা ভাল শোনায় না।

পার্থ বলে, ভেজাল আফিম গছিয়ে দশ টাকা মেরে দিয়েছ তুমি।

মালিকের সাফ জবাব ঃ নিজের ক্ষেত থেকে এনে দিই নি—ষোল-আনা খাঁটি, হলপ করে বলি কি করে? মালখানা থেকে অল্পসল্প করে সরায়, খদ্দের সঙ্গে সঙ্গে কাকচিলের মতো এসে পড়ে। তা বাবু, চোখ গরম কিসের অত! সাচ্চা হলে আপনি চোখ উলটে পড়তেন, আমার হাতে তখন দড়ি পড়ত।

উত্তপ্ত কণ্ঠে আবার বলে, ঝামেলা করবেন না। আমি সাফ বেকবুল যাব—তুধ ছাড়া অন্য কিছু বেচি নে। ব্যস, হয়ে গেল।

গাই দোওয়া সারা হয়ে তুধ মাপামাপি হচ্ছে ওদিকে। বচসা দস্তুরমতো। কেউ বলে, মাপে কম। কেউ বলে, স্রেফ ফেনা দিয়ে সেরে দিলে। কেউ বলে, বাঁটের মুখে নিফুটি সাদা জল বেরোয় কি করে, কী খাওয়াও বল দিকি? গোয়ালারও কাটা-কাটা জবাব ঃ না পোষায়, নিও না। পায়ে ধরে কে সাধছে।

পিছনে খানিকটা দূরে তুটো পিতলের বালতি। আধাআধি জলে ভরতি। সুযোগক্রমে এই জল সম্ভবত তুধ হয়ে উঠবে। বালতি তো বালতিই সই। পার্থ তু-হাতে তুলে নিল তুটো। বালতি হাতে হন-হন করে চলছে।

কী আশ্চর্য, দেখে না কেউ তাকিয়ে! কলহ নিয়ে মত্ত। পার্থ তখন হুড়হুড় করে বালতির জল ঢেলে ফেলল। এবারে নজর না পড়ে উপায় নেই।

বালতি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আরে, সত্যি সত্যি ভেগে পড়ে যে! ধর্, ধর্—

পার্থ দৌড়চ্ছে। লোক-দেখানো একটু না দৌড়লে চোর বলে

মানবে কেন? গোয়ালা এসে কঁ্যাক করে টুঁটি চেপে ধরল। হয়েছে—এবারে হয়েছে। এ জায়গায় মাসিমা নেই, নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ হাসিল হবে।

কোথায় নিয়ে চললে?

যমের বাড়ি।

পার্থর হাসি পেয়ে যায়ঃ বড় দুর্গম ঠাঁই! অনেক চেষ্টা করছি, মোকামে পৌঁছতে পারি নি। তার চেয়ে কনেস্টবল ডেকে জিম্মা করে দাও।

নয় তো আর সুখ হবে কিসে! হাতে আধুলি গুঁজে দিয়ে সরে পড়বে। পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলি তো আগে, পরের বিবেচনা মালিকের। মালিক যা করেন।

টেনে নিয়ে ফেলল সেই খোপের সামনে, মালিক যেখানে বিরাজ করছে। দুধের খদ্দের লোকগুলোও রে-রে করে ছুটেছেঃ মারামারি কিসের? কী হয়েছে?

চোরে বালতি নিয়ে পালাচ্ছিল।

পার্থকে ভাল করে দেখছে সকলে। কষ্টে অযত্নে গৌরবরণ মুখ তামাটে হয়ে গেছে। তবু যে ভালঘরের ছেলে, সেটা লুকানো যায় না। বচসার ব্যাপারে মনে মনে তারা গজরাচ্ছিল, এবারে কায়দা পেয়ে গেল।

ভদ্দরলোকের ছেলে দিনদুপুরে বালতি চুরি করতে এসেছে—চালাকির জায়গা পেলে না!

এত লোকের গর্জনে মালিক প্রমাদ গণেঃ জিজ্ঞাসা করেই দেখুন না। সামান্য ব্যাপারে উনি কি মিথ্যেকথা বলতে যাবেন?

পার্থ বলে, চুরি করেছি সত্যি কথা। দিক জেলে পুরে।

জনতার একজন কথা কেড়ে নিয়ে বলে, জেল সোজা নয় অত। মাকড় মারলে ধোকড় হয়। বালতি না হয় হাতে করে তুলেছিলেন—আর ওরা এই যে ওজনে কম দেয়, পানাপুকুরের জল মেশায়,

হরেক রকম চোরা ব্যবসা করে। কোনটা অজানা আমাদের ? ওদের তবে তো নিত্যি ছু-বেলা জেল হওয়া উচিত।

ভীত খাটালওয়ালা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে চায়ঃ আরে দূর, কী হয়েছে ! চলে যান আপনি বাবূ। বর্তন থাকে তো আন্থন, একসের ছুধ দিয়ে দিচ্ছি। দাম লাগবে না। বর্তন নেই তো ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিন। জ্বাল-দেওয়া ছুধের চেয়ে কাঁচার আরও সোয়াদ ভাল। দেখুন না খেয়ে।

চার চারবারের চেষ্টাতেও যমালয়ের দরজা খোলে না। তখন মাঝামাঝি একটা রফা করে নিচ্ছিল, জেলে গিয়ে থাকবে—তা-ও ভেস্তে গেল। মনের ছঃখে এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ঘুরে বেশ খানিকটা রাত্রি করে পার্থ বাসায় ফিরল। মাসিমা একেবারে মুকিয়ে ছিলেন। ইদানীং বিষম ভাল হয়ে গেছেন তিনি। কণ্ঠে মধু ঝরছে।

গিয়েছিলে কোথা বাবা ? ওঁর অমনি আলগা মুখ—ওসব গ্রাহ্যের মধ্যে আনে ! আমি ঘর-বার করছি—ছেলেমান্থষ রাগের বশে একমুখো বেরিয়ে পড়লই বা !

বলেন, জামাইবাবুরা এসে গিয়েছেন। নাকি চিঠি দিয়েছিলেন, সে চিঠি এসে পৌছয় নি। তোমার সম্বন্ধে কথাবার্তাও অনেক হল। জামাইবাবুর চা-বাগান তোমাকেই দেখেশুনে গড়েপিটে তুলতে হবে। বাগানেব অর্ধেক তোমার নামে লেখাপড়া করে দেবেন।

পার্থ অবাক। মাসিমা একেবারে অর্ধেক রাজত্বের বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। গল্পে আছে, রাজহস্তী পথের মান্থষ শুঁড়ে তুলে এনে সিংহাসনে বসাল—সেই ব্যাপার।

আরও আছে। অর্ধেক রাজত্বের উপরে রাজকন্সা। মাসিমা বলছেন, নমিতার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে জামাই করে নেবেন তোমায়। শুধু ছেলে দেখেই দেবেন। বাড়ি-ঘরদোর বাপ-মা আত্মীয়জন থাকলে সে জামাই শ্বশুরের হ্যাওটা হয়ে কাজকর্ম করবে না। দিদিকে বললাম,

আমাদের পার্থর মতন চালাকচতুর সৎ ছেলে কলিকালে হয় না। রাজি করিয়ে ফেলেছি। এখন ওঁরা শুয়ে পড়েছেন। সকালবেলা নমিতাকে দেখো, ওঁদের মুখেই শুনো সমস্ত।

কখন সকাল হবে, নিদ্রার অবসান হয়ে ডুয়ার্সের মানুষ ক'টি বাইরে আসবেন—পার্থর মোটে সবুর সইছে না। অবশেষে উঠলেন তাঁরা, আলাপ-পরিচয় ও কথাবার্তা হল। ঠিক কনে-দেখার মতো না হলেও নমিতাকে একনজর দেখে ফেলল আড়চোখে।

তারপরে পার্থ মরীয়া হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

সম্ভ্রান্ত স্টেশনারি দোকান—'রকমারি ভাণ্ডার'। একদঙ্গল মেয়ে এসে কেনাকাটা করছে। চুরি করবে পার্থ এখানে। অশিক্ষিত খাটালের লোক থানাপুলিশে ভয় পায়, শাস্তি নগদ-নগদ সেরে বিদায় করে। এরা কখনো আইনের বাইরে যাবে না। নেবেও একটা কোন ভাল জিনিস, যার জন্য সহজে নিষ্কৃতি দেবে না। কিন্তু তেমন জিনিস কোথায় হাতের কাছে? কাউন্টারে সব সস্তার মাল। পেরেক পুঁতে কয়েকটা টর্চলাইট ঝুলিয়ে রেখেছে, এই যা-হোক কিছু দামি ওর ভিতরে। একটা টর্চ খুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। দেখে পকেটে পোরে। খুব ধীরে-সুস্থে পুরছে। তাতে কাজও হয়েছে। একটা মেয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখে ফেলল। পাড়ার ডাক্তারবাবুর মেয়ে। নাম, যতদূর জানে, রেখা। পকেটের ভিতর দিয়ে টর্চের মাথার দিককার চেপটা অংশ বেরিয়ে আছে। কিন্তু আসল মানুষ সেলস্‌ম্যানটি যে তাকিয়েও দেখে না। ছোকরা মানুষ তো—মেয়ে-খদ্দের নিয়ে খুব ব্যস্ত।

আশায় আশায় তবু পার্থ দোকান ছেড়ে বাইরে যায় না। কেনাকাটা সেরে মেয়েগুলো বিদায় হল অবশেষে। কী আশ্চর্য, পার্থ যেন মাছি-পিঁপড়ে—চোখ তুলে তাকাবে না তার দিকে!

কাউন্টারের যেসব জিনিস খালি হয়ে গেল, ভিতর থেকে এনে এনে সাজাচ্ছে। টর্চের দিকটায় তাকিয়ে একজনকে ধমকে ওঠে: কী রকম কাজকর্ম তোমার শুনি? টর্চ রেখেছ তো ব্যাটারি রাখ নি। টর্চ কিনে তার সঙ্গে ব্যাটারি চাইবে না? কোথায় আছে তখন খুঁজে বেড়াও।

লোকটা টর্চের কাছে ব্যাটারি রেখে গেল। পার্থ মুঠো ভরে ব্যাটারি তুলে নেয়। এবারে তো একটিমাত্র মানুষ—ভাগ্যবশে যদি নয়নপাত হয়। কিছু না, কিছু না। তখন পার্থ উত্তপ্ত হয়ে ছোকরার সামনাসামনি দাঁড়ায়: হাতের কাজ সেরে নিন, একটা কথা বলব আপনার সঙ্গে।

ছোকরা সসম্ভ্রমে আহ্বান করে: ভিতরে বসবার জায়গা আছে। আসুন না, চলে আসুন।

দিব্যি চেয়ার-টেবিল পাতা, সেইখানে এনে বসাল। বলে, কী আনব বলুন—গরম চা, না ঠাণ্ডা সরবৎ?

গুরুঠাকুরের শুভাগমন হয়েছে যেন। পার্থ তিক্ত-কণ্ঠে বলে, কী রকম ব্যবসা করেন! গোটা দোকান যদি লোপাট যায়, চোখ তুলে দেখবেন না?

অপরাধীর ভাবে মুখ নামিয়ে মৃদু কণ্ঠে ছোকরা বলে, সত্যি কিছু হয়েছে নাকি?

রাগে রাগে পার্থ পকেটের টর্চ বের করে মুখের উপর ধরল: এই টর্চ নিয়েছি। তারপরেই ব্যাটারি এনে রাখলেন। টর্চ নিলেন তো ব্যাটারিও নিয়ে নিন—সেইটে যেন বলে দিচ্ছেন। ব্যাটারিও নিলাম চার-পাঁচটা—

ছোকরা নিরীহভাবে বলে, দরকার হয়েছে নিশ্চয়। পথে তো এখানে আলো দেয় না—ঘুরঘুট্টি আঁধারে ঘুরতে হয়, সেই জন্যে নিয়েছেন।

পার্থ বলে, তবে আর কি! টর্চের দরকার, নিয়ে নিয়েছি।

যাদের রুমালের দরকার, পাউডারের দরকার, ফিতের দরকার— নিয়ে যাক ব্যাগ ভরতি করে। সাইনবোর্ডটা মুছে তাহলে লিখে দিন, 'সদাব্রত ভাণ্ডার'।

জিভ কেটে ছোকরা বলে, কীটানুকীট আমরা। সদাব্রত করবার দেমাক কিসে হবে? খদ্দের আপনি—দামই দেবেন। সুবিধা মতো দিয়ে যাবেন।

দাম দেবার জন্য নিই নি। চুরি করেছি। চোখের উপরের চুরি ধরতে পারেন না। ব্যবসা চালান কি করে?

ছোকরা হেসেই খুন। পার্থ বলে, হাসছেন যে বড়?

আপনার কথা শুনে। চুরি করে কেউ কখনো তা বলতে যায়? চোর হলে ঠিক ধরতে পারি। কত ভাগ্যে আমাদের দোকানে পায়ের ধূলো পড়েছে। আবার বলছেন, চুরি করেছি।

চেনেন নাকি আমায়? কিন্তু কই আমি তো ঠিক—

আমরা কি চেনবার যুগ্যি? উঠতি গঞ্জে দোকান সাজিয়ে আজকেই না হয় ছুটো পয়সার মুখ দেখছি। আমাদের মতন দশখানা গাঁয়ের মানুষ কত নিয়েছে খেয়েছে আপনাদের সাগরগড়ের বাড়িতে।

ব্যস, তাবৎ আশা-ভরসার ইতি। এখন ছোরাছুরি মেরে সমস্ত দোকান লুঠ করে নিয়ে গেলেও এই ব্যক্তি রা কাড়বে না। টচ ছুঁড়ে দিয়ে পার্থ বেরিয়ে পড়ল।

এইবারে সর্বশেষ চেষ্টা। পার্থ সোজাসুজি থানায় গিয়ে উঠল। আজেবাজে মানুষ নয়, খোদ ও. সি. অর্থাৎ বড়বাবুকে ধরবে।

রাইটার-কনস্টেবল খইনি টিপছিল: কী দরকার বড়বাবুর কাছে?

পার্থ বলে, সেখানেই বলা যাবে।

ফালতু লোকের সঙ্গে বড়বাবু দেখা করেন না। দরকার লিখে স্লিপ পাঠাতে হবে।

চুরির ব্যাপার—

সে তো ঐখানে লেখা হচ্ছে। বেঞ্চির উপর ওদের পাশে গিয়ে বসে পড়ুন।

একগাদা মানুষ। এক একজন করে বলছে, ছোটবাবু লিখে নিচ্ছেন। বড়বাবু অতএব আছেন নিশ্চয় কামরার ভিতরে। কাজকর্মে এমন নিষ্ঠা নয় তো সম্ভবে না।

পার্থ যখন অনুগ্রহ চায় না, বরঞ্চ উল্টো—সে কেন স্লিপ পাঠিয়ে খাতির দেখাতে যাবে! দরজা ঠেলে কামরার ভিতর ঢুকে পড়ল। বড়বাবু ঘাড় হেঁট করে কি লিখছিলেন, ভ্রূকুটি-দৃষ্টিতে তাকালেন। আরও উত্তেজনার কারণ, পার্থ ধপাস করে বসে পড়েছে সামনের চেয়ার টেনে নিয়ে।

কী চাই ?

ওসবের জন্য ছোটবাবু আছেন তো বাইরে। কেউ বলে নি ?

ডায়েরি করতে আসি নি। চুরি করেছি আমি নিজে। চাক্ষুষ সাক্ষিও আছে। ডাক্তারবাবুব মেয়ে রেখা।

বড়বাবুর নয়ন বিস্ফারিত হয়ে রইল ঃ চুরি করে এসে ধরা দিচ্ছ ? নিজের আসতে হল—যাদের মাল চুরি করলে তারা কি করছে ?

পার্থ হেসে বলে, কেউ এগোতে চায় না। একটা মানুষ জেলে ঢুকে যেটুকু কষ্ট পাবে, তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট তাকে জেলে ঢোকানোর হাঙ্গামায়।

তোমারই বা মাথাব্যথা কেন তবে ?

প্রবীণ বহুদর্শী ব্যক্তি, পার্থের মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত কী ভাবলেন। মাথা নেড়ে বলেন, বুঝলাম। খাটতে চাও না, জেলে গিয়ে মজা করে নিখরচায় সরকারি খানা সাঁটবে।

পার্থ সকৌতুকে চেয়ে আছে।

স্বর ক্রমেই উগ্র হচ্ছে বড়বাবুর ঃ অপদার্থ! যা-কিছু করবার,

লোকে বয়স থাকতে করে নেয়। শরীরে সামর্থ্য থাকবে না, নড়তে-চড়তে কষ্ট হবে, লম্বা মিয়াদে জেলে পড়ে থাকবার সময় তখন। জেল আছেও সেই জন্যে। কাজকর্ম না করে শুধু যদি জেলের ভরসায় থাক, গভর্নমেণ্ট ফতুর হয়ে যাবে যে!

কী ধরনের কাজকর্ম, বুঝতে পার্থর দেরি হয় না। হঠাৎ বড়বাবু সুর বদলে বলেন, কি চুরি করলে?

টর্চ একটা।

জিনিসটা কি রকম—দেশি না বিলাতি? হাত বাড়িয়ে বলেন, দেখি—

জিনিস ফেরত দিয়ে এসেছি।

ফেরত দিয়ে ইয়ার্কি করতে এসেছ থানায়?

বড়বাবু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন: বেরোও বেরিয়ে পড় এক্ষুনি। সহজে না গেলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করব। জেল মামার বাড়ি কিনা—গিয়ে অমনি পড়লেই হল!

অনেক বেলায় বিরস মুখে পার্থ বাসায় ফিরল। অনুমান হয়, তার অদর্শনে বাড়িতে রীতিমত তোলপাড় পড়েছিল।

মাসিমা বলেন, ঠাকুরমশায় এসে দিন দেখে দিলেন। ভাদ্দর মাসে এর পরে অকাল পড়ে যাবে। বিয়ে আজকেই।

বজ্রাহত পার্থ বলে, সে কী! শুভস্য শীঘ্রম্—সে অবিশ্যি ভালই। কিন্তু আমি যে খেয়েটেয়ে এলাম।

মাসিমা হেসে উড়িয়ে দেন: কনেরই কাঠ-কাঠ উপোস। বর একটু চা-টা খেলে দোষের হয় না।

চা কী বলছেন, ভরপেট ঠেসে খাইয়েছে। দেশের একজনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল—

হোক গে। পাত্রী অরক্ষণীয়া—ভাত খেলেই বা কী! ঘরে গিয়ে এইবার বিশ্রাম করগে বাবা। একটু পরে গায়ে-হলুদ।

নিরুপায় পার্থ ঘরে ঢুকল। নড়বড়ে তক্তাপোষ সরে গিয়ে খাট পড়েছে। খাটের উপর গদি, তোষক, বালিশ, পাশ-বালিশ, ধবধবে চাদর। সমস্ত পার্থর জন্যে। জামাই-আদর বলে থাকে, এই বুঝি তার শুরু।

গদির উপর বসে পড়তে মাসিমা খুট করে দরজায় শিকল তুলে দিলেন।

পার্থ কাতর হয়ে বলে, শিকল দেবার কী হল মাসিমা? যদি ধরুন, কোন কারণে বাইরে যেতে হয় একবার।

জানলায় এসে মধুর হেসে বিগলিত কণ্ঠে মাসিমা বললেন, যাবে। তার জন্যে কী হয়েছে! দিদির দুই ছেলে—তোমার দুই শালা—রইল বাইরে। নীলমণি আছে। বললেই দুয়োর খুলে দেবে। বিয়ের বর কিনা আজ—ওরা সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, যা-কিছু দরকার ওরাই করে দেবে সমস্ত।

শিকলে তালা এঁটে বিয়ে-বাড়ির দশ রকম ব্যবস্থায় মাসিমা দ্রুত চলে গেলেন।

বোঝা গেল ব্যাপার। জেলে যেতে চাচ্ছিল, পাকে-প্রকারে তাই ঘটল। সারাদিন এমনি তালা বন্ধ থাকবে। বিয়ের মন্ত্র পড়া এবং কনের সাত-পাক ঘোরা সমাধা না হওয়া পর্যন্ত ছাড় নেই। সম্ভবত তার পরেও না। কিছু ছাড় হতে পারে একেবারে ডুয়ার্সের জঙ্গলে নিয়ে। বন্ধ ঘরের মধ্যে সারাদিন পার্থ একা একা ভাবছে। মন্দ কি! সে তো মরীয়া। মরণের চেষ্টা করেছে কতবার। হল না তো জেল। জেলও হল না, তখন এই বিয়ে। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে তো মোটের উপর।

শুভদৃষ্টির সময় চারি পাশ থেকে বলছে, বর-কনে ভাল করে তাকাও এইবার। জোরালো আলো ধরেছে চাদরে-ঢাকা দু-জনের পাশে। পার্থ তৎক্ষণাৎ চোখ বোঁজে। আড়চোখে সেই একবার কনে দেখে নিয়েছিল, সে আতঙ্ক কাটে নি এখনো। বাসরে ঘুমের

ভান করে পাশ ফিরল। দু-তিনটে মেয়ে বাসর জাগতে এসেছিল, ব্যাপার বুঝে নিয়ে তারাও রংতামাসা করে না। ফুলশয্যার রাত্রে প্রদীপ নেভানো বড় অলক্ষণ। কিন্তু পার্থর নাকি উৎকট চোখের অসুখ, আলোয় চোখ করকর করে।

অন্ধকার ঘরে নতুন বউয়ের সঙ্গে ফিসফিসয়ে দু-চারটে কথা। নমিতা বলে, আমিও আয়নায় মুখ দেখি নে। ভয় করে।

পার্থ বলে, অমন হল কি করে ?

বাঘে ধরেছিল। ছোট্ট আমি তখন। লোকজন গিয়ে পড়তে বাঘ ছেড়ে দিয়ে পালাল।

নতুন বউয়ের কথাবার্তা কিন্তু ভারি মিষ্টি। অন্ধকারে শুনতে ভাল লাগে। নতুন বউয়ের গায়ে হাত দিয়ে সর্বাঙ্গ শিরশির করে। ঘর অন্ধকার করে নিতে হয়, এই যা। ফাঁক পেলেই পালিয়ে দূর-দূরান্তর চলে যাবে, পার্থ মনে মনে ঠিক করেছিল। কিন্তু একটা রাত্রেই সঙ্কল্প মিইয়ে এল। দিনমানটা পালিয়ে থাকবে, রাত্রিবেলা অন্ধকারে কিসের ভয় !

এই রকম সত্যি সত্যি চলেছিল কিছুকাল। অনেকটা দায়ে পড়েও বটে। শ্বশুরের বেনামি চা-বাগান নিয়ে পার্থ উঠেপড়ে লাগল। ভোররাত্রের ট্রেনে বেরিয়ে পড়ত। কুলিকামিন নিয়ে কাজকর্ম— সমস্তটা দিন কোথা দিয়ে কাটত, ঠাহর হত না। ফিরত এক প্রহর রাত্রে। সেই সময় এমন হয়েছে, কাজের চাপে একটা রাত্রি হয়তো ফিরতে পারল না বাসায়। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে উসখুস করেছে বীভৎস-মূর্তি নমিতার জন্য।

* * *

সভা উপলক্ষে আমি ডুয়ার্সে গিয়েছিলাম। কুসুমবাড়ি বাগানে থাকতে দিয়েছে। কুসুমবাড়ির নামডাক খুব। গেস্টহাউস ভূমি থেকে আধতলা সমান উঁচু—সাপ উঠতে পারে না ঘরে, যত

বর্ষাই হোক, মেজে কখনো স্যাঁতসেঁতে হয় না। দামি আসবাবপত্র। কলকাতার শৌখিন-পাড়া থেকে সবচেয়ে চমৎকার কয়েকটা কুঠুরি যেন জঙ্গলের মধ্যে এনে বসিয়েছে।

পার্থপ্রতিম ঘোষের সঙ্গে ঐখানে পরিচয়। বাগানের অর্ধেক হিস্যার মালিক ও ম্যানেজার। আমাদের মতো শহুরে মানুষ পেয়ে বর্তে গেছেন। মিনিট দুয়েকের ভিতর অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, এবং ঘণ্টা খানেকের ভিতর সমস্ত বলেকয়ে খালাস।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল হঠাৎ। অকাল-বর্ষা। ঘরের মধ্যে পার্থপ্রতিম ও আমি। মুহুর্মুহু চা আসছে। তেমন চা আপনারা মুখে দিতে পান না—অতিথির জন্য আলাদা করে রেখে দেওয়া। চা আসে, সঙ্গে বিবিধ আয়োজন। প্রতিবারেই নতুন নতুন পদ। গল্প থামিয়ে পার্থপ্রতিম অমনি স্ত্রীর কথায় আসেন ঃ আমার স্ত্রী পাঠিয়েছেন। খেয়ে দেখুন, আমার স্ত্রী নিজের হাতে তৈরি করেন সমস্ত। বলবেন না আর—আমার স্ত্রী নাবালক বানিয়ে ফেলেছেন আমাকে শুধু নয়, বাগানসুদ্ধ সকলকে····। এই এক দুর্বলতা দেখছি, স্ত্রীর নামে গদগদ। প্রতি কথায় 'আমার স্ত্রী' 'আমার স্ত্রী'—এক রকম মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে। বারম্বার না বললে সেই মহিলা যেন অন্য কারো স্ত্রী হয়ে যাবেন। তখন মনে হল, বিয়ের যাবতীয় গল্প বানিয়ে বললেন হয়তো। আমরা যেমন বানিয়ে বানিয়ে কাগজে লিখি।

অবশেষে দেখলামও মহিলাকে। বাঘ পালিয়ে গিয়েছিল বোধকরি চোয়ালের এক খাবলা মাংস মুখে করে নিয়ে। ফুটো দিয়ে দু-পাটি দাঁতের অনেকখানি দেখতে পাওয়া যায়। একটা চোখ অস্বাভাবিক রকম বড়, আর একটার ঢেলা গলে গিয়ে সাদা মার্বেলের মতো হয়ে আছে।

পার্থপ্রতিম তখন বলছেন, এবারে বড়দিনের সময় আমার স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতা যাব। বড়দিনের সে জলুষ নেই আগেকার মতো। তা হোক, আমার স্ত্রী কলকাতা দেখেন নি। কয়েকটা দিন আমোদস্ফূর্তি করে আসা যাবে।

ললাট-পাঠ

রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দনে অনুলিপ্ত কপাল, দুই বাহু ও বক্ষগহ্বর। গায়ে নামাবলী। ঠিক যেমনটি হতে হয়। আপিস-পাড়ায় ল্যাম্পপোস্ট ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভৃগুচরণ জ্যোতিষার্ণব। দাঁড়ায় এসে বিকাল পাঁচটার কাছাকাছি, দুটো-একটা করে আপিসের ছুটি হওয়া যখন শুরু হয়েছে। খোলা ফটকের পথে বন্যাস্রোতের মতো মানুষ বেরোয় —মুখে ক্লান্তির কালসিটে, হাতে শূন্য টিফিনের কৌটো। অফিসাররা তো মোটর হাঁকিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেলেন। চলেছে থপথপ করে কেরানী-মানুষদের সান্ধ্যভ্রমণ। মেয়ে-কেরানীও বিস্তর। বেলা দশটায় দেখবেন জুঁইফুলের মতন এক-একটি। ফুটফুটে ফর্সা, গণ্ডে গোলাপী আভা। চেয়ে থাকতে হয়, চেয়ে চেয়ে কতজনের গাড়ির তলে যাওয়ার উপক্রম। এখন ফিরছে সেইসব মেয়ে— কটকটে কাল রং, চোখ বসে গেছে, মাথা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। প্রসাধনের জলুস পাঁচটা অবধি রাখা দুস্কর—বিশেষ করে সস্তা দামের এই যত দেশী প্রসাধন চলছে আজকাল।

ভৃগুচরণ জ্যোতিষার্ণব ল্যাম্পপোস্ট ঠেস দিয়ে একদৃষ্টে দাঁড়িয়ে। চোখের উপর এইরকম সাদামাঠা দৃষ্টি না হয়ে যদি বর্শাফলক থাকত একজোড়া—খোঁচা দিয়ে দিয়ে পথচারীদের সচেতন করা যেত। দলে দলে চলেছে আপিস-ফেরতা নিস্পৃহ উদাসীন মানুষ—কতক্ষণে বাড়ি গিয়ে হাত-পা ধুয়ে বিছানায় গড়াবে, এই মাত্র লক্ষ্য। চন্দনের ডোরা-কাটা জ্যোতিষার্ণব হা-পিত্যেশ দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল—চোখ তুলে সেদিকে কেউ একবার তাকিয়ে দেখে না।

অবশেষে সুন্দর চেহারার স্বাস্থ্যবান এক ছোকরা কাছে চলে এল। পুলকিত ভৃগুচরণ—দৃষ্টির বঁড়শি একটা শিকার অন্তত গেঁথে তুলেছে।

ছোকরা বলে, কী দেখছেন ঠাকুরমশায় ?

দরখাস্ত করে দাও। দেরি কোরো না।

কিসের দরখাস্ত, কার কাছে করব ?

ভৃগুচরণ হেসে ফেলে : জানেন না যেন মোটে !

ছোকরা বলে, সত্যিই জানি নে। আপনি বলে দিন।

আজকে না জান তো কাল জানবে। কাল না জানলে পরশু। অফিসের চাকরি না চাও, বাইরে দরখাস্ত কর। বৃহস্পতি তুঙ্গী। এই সুযোগ। ছাই-মুঠো ধরলে সোনা-মুঠো হবে।

ছোকরা অবাক হয়ে গেছে। বলে, কী আশ্চর্য ব্যাপার ! আপনাকে, জ্যোতিষীমশায়, বাজিয়ে দেখছিলাম একটু। আপিসে সত্যিই ভাল চাকরি খালি হয়েছে। এত ভাল যে, দরখাস্ত করতে ভরসা পাচ্ছি নে। বুড়ো অফিস-সেক্রেটারি মারা গেছেন। বিচার করে দেখলে, যিনি গেলেন তাঁর চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতা আমার। কিন্তু যোগ্যতার বিচাবে ক'টা চাকরি হয়—এটা-ওটা অনেক-কিছু লাগে।

ভৃগুচরণ বলে, দরখাস্ত করে দাও, আমি বলছি। চাকরি তো চাকরি—আজ যদি শুনতে পাও, ভারতভূমির জন্যে রাজা খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তুমি দরখাস্ত করলে তা-ও ঠিক লেগে যাবে। বড় সুদিন তোমার।

ছোকবা প্রশ্ন কবে, আপিসেব খবর জানলেন আপনি কেমন করে ?

শুধু আপিস কেন, তোমার মনের খবর নয় ? দরখাস্ত ছাড়তে দ্বিধা করছ, তা-ও তো জানি।

কী করে জানেন এত সব ?

ললাটের উপর সমস্ত লেখা আছে। রাজৈশ্বর্য্যলাভ—জ্বলজ্বল করছে ওই। লেখা পড়ে বলে দিই। পড়তে জানলে তোমরাও বলবে—বাহাদুরি কিছু নেই।

আবার ক'দিন যায়। তিনটে মেয়ে যাচ্ছে। একটি তার মধ্যে গটগট করে ভৃগুচরণের দিকে চলল।

পেছন থেকে ডাকছে: কোথায় যাস রে শুক্লা?

ওই মানুষটার কাছে। চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে যেন।

কাছে গিয়ে মারমুখি হয়ে পড়ে: ছুটির সময়টা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন?

আপনার জন্য।

থতমত খেয়ে শুক্লা মুহূর্তকাল জবাব দিতে পারে না।

তারপর বলে, দাঁড়ানো বের করে দেব পুলিস ডেকে। জানেন, পুলিসের একটা আলাদা বিভাগ হয়েছে আপনাদের জন্যে? নামাবলীর তারা খাতির রাখে না।

ভৃগুচরণ শান্তভাবে বলে, বিভাগটা আমাদের জন্য নয়—যারা অসৎ অনাচারী তাদের জন্য। আমি ছাত্র, আমি পাঠক। আপনার চেহারা দেখি নে, দেখতে আসি আপনার ললাট। দেখবার মত বস্তু বটে। হাজারে একটা এমন দেখা যায় না।

মুখ ফিরিয়ে শুক্লা সঙ্গিনীদের বলে দেয়, তোমরা এগুতে লাগ। আমার একটু দেরি হবে।

ভৃগুচরণকে জিজ্ঞাসা করে, কী আছে আমার ললাটে?

রাজলক্ষণ। আপনি রাজরানি—

ঠিক বলেছেন। শুক্লা খিলখিল করে হাসে: রাজরানি তাতে সন্দেহ কী? দশটা থেকে টাইপ করে করে দশ আঙুলে ব্যথা হয়ে গেছে। কুলায় না বলে সন্ধ্যার পরে এক্ষুনি আবার রাজরানি টুই-শানিতে বেরুবেন। তিন ছাত্রী একসঙ্গে, পনের তঙ্কা রাজরানির মাসিক নজরানা।

থেমে গিয়ে বড় বড় চোখ মেলে শুক্লা জ্যোতিষার্ণবের দিকে তাকাল: আপনিই বোধহয় সেই। আচ্ছা, আমাদের ডেসপ্যাচ-সেকসনের সমীরণবাবুর ললাটও কি আপনি দেখেছিলেন?

কে সমীরণ, চিনি না তো।

সেই ভদ্রলোককেও ধরেছিলেন এমনি। দরখাস্ত ছাড়লে নাকি ভারতভূমির রাজা করে দেবে, এই সব। সেই গল্প সমীরণবাবু আপিসময় চাউর করে দিলেন। উঃ, কী ভাল লোক আপনি—যার দিকে চোখ পড়ে তাকেই রাজ্যপাট দিয়ে দেন। আপনি বিধাতাপুরুষ হলে সুখের অন্ত থাকত না, মহারাজা-মহারানি হয়ে যেত সবাই।

ভৃগুচরণ হাসছে মৃদু মৃদু। বলে, আমি কিছুই করি নে। শুধু পড়ে দিই। বই পড়ে আপনি যেমন বলেন, ললাট পড়ে আমিও তেমনি বলি। আমার পাঠের অন্যথা হবে না। আজকে আপনি যা-ই হন, ভবিষ্যতে নিশ্চয় রাজরানি।

অধীর কণ্ঠে শুক্লা বলে, কবে? চুল পেকে দাঁত নড়বড়ে হয়ে যখন গয়া-কাশী করে বেড়াব, সেই বয়সে?

হেসে ভৃগু বলে, তার আগে—অনেক আগে। গয়া-কাশীর দিনের তো অনেক বাকি এখনো।

ঠিক এমনি সময়ে সমীরণের আবির্ভাব। এদিক-ওদিক খুঁজছিল। তারপর দেখতে পেয়ে দ্রুতপায়ে চলে এল।

জ্যোতিষার্ণব মশায়, সেই ল্যাম্পপোস্ট ছেড়ে দিলেন কেন? খুঁজে খুঁজে পাই নে।

ল্যাম্পপোস্ট ছেড়ে গাড়ি-বারান্দায় এসেছি। আচ্ছাদনের নিচে। ক্রমোন্নতি, দেখছেন না? আরও হবে—আপিসে যা আমার গুণপনা ছড়াচ্ছেন!

শুক্লাকে দেখে সমীরণ হাসিমুখে তার দিকে চাইল। বলে, আপনার কথায় দরখাস্ত তো দিলাম। আশাপ্রদ মনে হচ্ছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর কামরায় ডেকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বাড়িতে যেতে বলেছেন রবিবারে।

ভৃগুচরণ গম্ভীর হয়ে ঘাড় নাড়েঃ জানি রে ভাই, সমস্ত জানি। ললাটে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে তবেই তো বললাম তোমায়।

আচ্ছা, আসি তবে এখন। মনে ভাবলাম, খবরটা আপনাকে দিয়ে যাই। তা দেখুন, কথা ফলে যায় তো আপনার উন্নতিও এই গাড়ি-বারান্দা অবধি নয়—অট্টালিকার চূড়োয়। তখন আর একলা শুক্লা দেবী নয়, অফিস সুদ্ধ ভেঙে এসে পড়বে আপনার কাছে।

শুক্লার দিকে একটা চোরা চাউনি হেনে সমীরণ বিদায় হল।

আবার সেই আগেকার প্রসঙ্গ। শুক্লা বলে, আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লে শুনব না। ভাল সময় কদ্দিন পরে—ঠিক করে বলে দিন। আর আমি পারছি নে।

জল এসেছে বুঝি মেয়েটার চোখের কোণে। ভৃগুচরণের করুণা হল। বলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয় না। বসিগে কোথাও চলুন। ভাল করে দেখে ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করতে হবে। পার্কে চলুন।

পার্কে গিয়ে গ্যাসের আলোর নিচে শুক্লার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে জ্যোতিষার্ণব। মুখ আপনা-আপনি কেমন নত হয়ে আসে। তারপরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন—শুক্লাদের ঘর-সংসারের কথাও এসে পড়ে তার মধ্যে। মৃদু হেসে ভৃগুচরণ শেষটা রায় দিয়ে দেয়ঃ নিজে না-ও যদি কিছু হন, রাজার বউ তো রাজরানি। অন্য কেউ ধরুন রাজা হয়ে গেল—তাকে বিয়ে করে ফেলবেন।

বেশ খানিকটা রাত হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ জেনে শুক্লা আনন্দে ডগমগ। খুব বেশি তো একটা বছর—এ দিন থাকবে না তারপরে। ললাটলিপি অদৃশ্য অক্ষরে বলে দিচ্ছে।

অনেক ইতস্তত করে এক সময়ে শুক্লা বলল, আপনার অনেক সময় নষ্ট করে গেলাম। আরও কতজনকে দেখতে পারতেন। মাইনে পেয়েছি আজ। আপনার পারিশ্রমিক কত, যদি জানতে পারি—

এক পয়সাও নয়।

বিনা ফী-তে দেখে বেড়ান নাকি? কম হোক বেশি হোক, আমি তবু পয়সা নিয়ে খাটি। আপনার দশা দেখছি আমার চেয়েও খারাপ।

সকলের কথা হচ্ছে না তো। বউনির সময়ের মক্কেল আপনারা, আপনাদের কোন ফী নেই।

বেশ, ফী না নেবেন তো চলুন কোনখানে। গায়ে নামাবলী জড়িয়ে চপ-কাটলেট চলবে না বোধহয়। মিষ্টিমিঠাই খাওয়া যাবে।

চপ-কাটলেট কেন, চিকেন-হ্যামও চলে। নামাবলী কিংবা ভৃগুসংহিতা কোথাও বারণ কিছু লেখে নি।

সারাদিনের খাটনিতে শুক্লার ক্ষিধে পেয়েছে খুব। মন-ভরা স্ফূর্তি, ব্যাগে পুরো মাসের মাইনে। খুব খেল সে। ভৃগুচরণও নিতান্ত কম যায় না। কিন্তু ব্যাগ খুলবার আগেই হোটেলের বিল ভৃগুচরণ মিটিয়ে দিল।

শুক্লা ঠেকাতে গিয়ে পারল না। ঘাড় দুলিয়ে বলে, কী অন্যায়—কী অন্যায়! আমি নিয়ে এসেছি, দাম আমিই দেব। কিছুতেই হবে না।

ভৃগু বলে, দেবেন, তার জন্যে কী! রাজরানি যখন হবেন, সুদ-সমেত চেয়ে নিয়ে আসব।

তারপরে আরও এসেছে শুক্লা। গাড়ি-বারান্দায় বার দুই, এক-তলার ভাড়াটে কুঠুরিতে বার কয়েক। এবং সর্বশেষ বড় রাস্তার উপর মস্ত বড় সাইনবোর্ড-ওয়ালা ভাগ্যগণনা-মন্দিরে। কর্মখালির খবর আছে, দরখাস্ত করবে কিনা? মা পীড়াপীড়ি করছেন বিয়েয় মত দেবার জন্য, কী করবে? এমনি সব। ফী লাগে না শুক্লার, হিসাব থাকছে—রাজরানি হবার পর একসঙ্গে শোধ হবে।

মাঝে মাঝে শুক্লা অস্থির হয়ে বলে, এক বছর বলেছিলেন, বছর তো কাবার হয়ে যায়।

বছরের ভিতরেই হয়ে যাবে। ললাট পড়ে বলেছি, মিথ্যা হবে কেমন করে?

ভৃগুচরণ সুখবরটা দিল: সমীরণ এসেছিল কাল। অফিস-সেক্রেটারি তাকেই করল। আসছে মাস থেকে বসবে। আপনারা শোনেন নি কিছু?

হাসতে হাসতে তারপর বলে, যা দেখছি, সোজাসুজি রানি আপনি হতে পারলেন না। রাজা বিয়ে করেই রানি হতে হবে।

মাস দেড়েক পরে আবার একদিন শুক্লা এসে পড়ল। উত্তেজনায় কাঁপছে।

কী হয়েছে শুক্লা দেবী?

নেমন্তন্ন-চিঠি দেয় নি আপনাকে? সমীরণের যে বিয়ে। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মেয়ের সঙ্গে। সেক্রেটারি হয়েছে নিজের কোন গুণে নয়, খাঁদা বোঁচা মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করে। পয়লা নম্বরের ধাপ্পাবাজ, এখন বুঝতে পারছি। ভালই হয়েছে, আপদ সরে গেছে। আপিসের কেউ কিছু জানত না, কোনদিন কাউকে বুঝতে দেয় নি—

বলছে, ভাল হয়েছে—দুই গালে অশ্রুর ধারা গড়াচ্ছে তখন।

ভৃগুচরণ চিন্তান্বিত। একের পর এক টেলিফোন—সহকারীকে ধরে যা হোক কিছু জবাব দিতে বলল। ভাগ্য-জিজ্ঞাসু অগণ্য লোক বাইরের ঘরে। অনেকে ব্যস্ত হচ্ছে। সহকারী গিয়ে বলল, পূজো শেষ হতে এখনো আধ ঘণ্টার উপর। জরুরি কাজ থাকলে চলে যেতে পারেন।

সবাই সঙ্গে সঙ্গে চুপ। একজনও উঠল না।

শুক্লা গালি পাড়ছে: ধাপ্পাবাজ আপনিও কম নন। যা বলেন কিছুই মেলে না। রাজরানি না হাতী! আপিসে সবাইকে বলব। যেখানে যাব, বলে বেড়াব।

ভৃগুচরণ শান্তভাবে বলে, ক'দিন আর বাকি বছর পুরবার?

গেল-বছর ছাব্বিশে মাঘ বলেছিলেন। তারিখ লিখে রেখেছি। আর আজকে হল পনেরই।

ভৃগু হিসাব করে বলে, এগার দিন এখনো বাকি আছে। অনেক সময়।

শুক্লা বলে, এগার মাসে কিছু হল না, এগার দিনে হবে?

হতেই হবে। ললাটের পাঠ কখনো ভুল হয় না আমার। এবারও হবে না।

এক হপ্তা পরে আবার এসেছে। সামলে নিয়েছে শুক্লা পুরোপুরি। হাসিখুশি ভাব। বলে, কী গো গণৎকার মশায়, রাজমুকুট গড়িয়ে ফেলেছেন নাকি আমার জন্য? আর তো চারদিন।

এবারে ভৃগুচরণ ঘাবড়ে যাচ্ছে। এমন নাছোড়বান্দা মেয়ে তো দেখা যায় না। তাগিদ দিয়ে দিয়ে ভাগ্য আদায় করবে।

সোজাসুজি রাজরানি হলাম না। ঘুর-পথে হবার কথা বলেছিলেন, তা-ই বা কোথায়?

ভৃগুচরণ জ্যোতির্ষার্ণব নিরুত্তর। পশার-প্রতিপত্তি যায় এবারে বুঝি! বাইরের ঘরে একগাদা মক্কেল—চেঁচামেচি করে এখুনি এক কাণ্ড ঘাটিয়ে বসবে। কিন্তু শুক্লা তা করল না। হাসিমুখে ভৃগুর দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকে। বলল, আচ্ছা, আমি একটা উপায় বলছি। অন্য রাজা যখন পাওয়া যাচ্ছে না, আপনিই বরাসনে বসে পড়ুন।

ভৃগুচরণ আঁতকে ওঠে: অ্যাঁ, সে কি! আমি কেমন করে—

ললাট-লিপি নইলে মিথ্যা হয়ে যায় যে!

কিন্তু রাজা তো আমি নই—

রাজা কী বলছেন—মহারাজা। বাইরের ঘরে বিল্বগড়ের রাজা বসে আছেন। রাজত্ব গিয়ে যিনি মোটর-গ্যারেজ করেছেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, পূজো শেষ হল মহারাজের?

একটু ভেবে নিয়ে ভৃগু বলে, এই চারদিনের মধ্যে কিন্তু। নয়তো লিপির পড়া মিথ্যে হয়ে যাবে। দিনক্ষণ দেখে এসেছেন আপনি?

শুক্লা সংশোধন করে দেয়ঃ আপনি নয়, তুমি—

চল গোয়া—

সারা পথ কষ্ট। রাতে ঘুমুতে দিল না। স্টেশনে স্টেশনে ডেকে তুলে মালা দিচ্ছে, চন্দন লেপছে কপালে। পুণায় নামলাম, তখন আর মানুষ বলে মালুম হবে না। নাক-চোখ-মুখ নেই, গা-গতর কিছু নেই—ভারী ভারী ফুলের বাণ্ডিলের তলায় দুটো করে পা বেরিয়ে আছে। শিবাজি-মন্দিরে লোক ভেঙে পড়ছে। বেদির উপর তুলে দিয়ে বলে, বলুন কিছু এবারে—

গোয়ায় গিয়ে পৌঁছুলে নিদারুণ ঠেঙাবে, গুলিও করতে পারে, এই মাত্র শুনেছিলাম। পথের এত সব হ্যাঙ্গামের কথা বলে নি কেউ। বললে বোধহয় পিছিয়ে যেতাম। দোহাই পাড়িঃ দেখুন, মারাঠির যা বিদ্যে—কথাবার্তা বুঝতে পারি খানিক খানিক। রাষ্ট্রভাষা যেটুকু জানা, সে হয়তো গোয়ালা-কয়লাওয়ালার সঙ্গে চালানো যায়, বক্তৃতায় চলবে না। তবু মাপ হল নাঃ তা কি হয়েছে! বাংলাতেই ছাড়ুন। জ্বালাময়ী হলে হল, মানুষজন বুঝে নেবে।

পুণা থেকে বেলগাঁও। খাতির যতই করুক, টিকিট কাটতে হল নিজ নিজ পয়সায়। গোড়া থেকে সেই কথা। বার ঘণ্টার পথ। রাত্রি একটায় স্টেশনে নেমে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি, বৃষ্টি! সৃষ্টি-সংসার ভাসিয়ে দিল আজকে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, অলক্ষ্য অন্ধকার থেকে সাড়া এল, চলে আসুন—

নিঃশব্দে চলেছি তাদের পিছু পিছু। চারিদিক নিষুপ্ত, একটানা জলস্রোত। এক ভাঙা বাড়িতে গিয়ে উঠলাম, অনেক লোক

আগে থেকে এসে আছে। বলে, তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিন। সময় নেই।

আধ-মগ চা আর গোণাগুণতি একখানা করে রুটি। গরম চা হড়হড় করে গলায় ঢেলে চাঙ্গা হয়ে নিলাম। ট্রাক দাঁড়িয়ে রাস্তার উপর। সত্তরটি প্রাণী মোটমাট। কিন্তু পায়ে হেঁটে যখন যাওয়া যাবে না, এবং ট্রাকও একটা বই দুটো নেই— সত্তর না হয়ে সাত-শ হলেও ওর মধ্যে উঠে পড়তে হবে। কোন কায়দায় উঠবেন, সে আপনার ভাবনা।

আঁকাবাঁকা পথ পাহাড়ের গা বেয়ে। এই চলে গেলাম— অনেকক্ষণ পরে দেখছি, সেই পথটাই হাত কয়েক নিচে। টানেলের ভিতর ঢুকে পড়লাম একবার। বৃষ্টিটা মাঝে বন্ধ হয়েছিল, আবার নামল। বৃষ্টি, অন্ধকার আর মানুষের গাদাগাদি—পথের মজাটা উপভোগ হচ্ছে না। বহাল তবিয়তে আর একবার আসব এদিকে। যদি অবশ্য সশরীরে ফিরে আসতে পারি সালাজার মশায়ের অতিথিশালা থেকে।

চল্লিশ মাইল এসে আনমোর কাস্টমস। টাকাপয়সা কাপড়-চোপড় জমা দিয়ে দিন, নাম-ঠিকানা লিখুন। ফিরতি মুখে যাবতীয় মালপত্র বুঝে নিয়ে যাবেন। না ফেরেন তো দেশের ঠিকানায় ফেরত পাঠাবে। আপনার ভালমন্দ যা-ই হোক, মালের এক তিল মার যাবে না।

মালকোঁচা এঁটে নিলাম। গায়ে কামিজ, গামছা বাঁধা কোমর বেড় দিয়ে। পুরোপুরি রণসজ্জা। আরও পাঁচ মাইল ভারতের এলাকা। পায়ে হেঁটে যেতে হবে। সদর পথে কড়া পাহারা। গাইড হয়ে এসেছে তাই ক'জন—সুলুকসন্ধান বুঝে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

সাপের মতন প্রায় বুকে হেঁটে চলেছি। সীমান্তে এসে দাঁড়ালাম, তখন ফরশা হয়ে গেছে। জায়গাটাও একেবারে ফাঁকা

মাঠ। মাঠের ওপারে জঙ্গল। পশ্চিমঘাট-পর্বতমালা দিগন্ত ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। গাইডেরা ত্রস্ত হয়ে বলে, গুলি করবে—শুয়ে পড়, শুয়ে পড়। সত্তর জন আমরা চক্ষের পলকে মাঠের জল-কাদার সঙ্গে লেপটে গেলাম। গাইডেরাও শুয়েছে—একজন শুধু হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শুয়ে শুয়ে মৃদুকণ্ঠে বচসা চলেছে, পতাকা কে নেবে কাঁধে? গুলি করবে নির্ঘাৎ সেই মানুষকে তাক করে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী সব অঞ্চলই আজকে পাশাপাশি—প্রথম বুলেট বুকে নেবে কোন অঞ্চলের কোন ভাগ্যবান! মারাঠিরা কর্মকর্তা—আমাদের উপর কেমন-ধারা টান সেই স্বদেশি যুগ থেকে। বললেন, সর্বকাজে বাঙালি চির-কাল আগুয়ান—তোমরাই নেবে পতাকা। কে নেবে, মানুষ ঠিক কর।

লড়াইয়ের ফেরতা মোহন সিং ও সোনোপন্থ—অঙ্গ চিরলে এখনো দেড়-দু-গণ্ডা গুলি বেরুবে—পতাকার দাবিতে ঝগড়া বাধিয়েছে তারা। আর হল না—ঝিঁঝি ডাকতে লাগল বনান্তরাল থেকে। ঝিঁঝি নয়—যে লোকটা আগে চলে গেছে, তার সঙ্কেত। সময় হয়েছে, যাত্রা এবারে। সাঁ করে এক ছুটে মাঠ পেরিয়ে বনে ঢুকে পড়।

ব্যস, এসে গেছি গোয়ার ভিতর। পাহারাদার মশায়েরা রাজপথে ওদিকে মোক্ষম পাহারা দিচ্ছেন। ঘুরুন তাঁরা পাহারা দিয়ে দিয়ে। বনজঙ্গল পার হয়ে আবার জনপদে বেরুব, পুরো মিছিল তখন সাজানো হবে। পথ কতখানি রে বাপু—চলেছি, চলেছি, চলার আর শেষ নেই। দেবরাজও কি দিন বুঝে নামলেন? বৃষ্টি ছাড়ছে না, ভিজে জবজবে হয়ে গেছি। জঙ্গল ঘন হয়ে পথ এঁটে যায় একসময়। গাইডদের কুড়াল আছে, গাছপালা কেটে পথ করে দিচ্ছে। ঐ কাটবার সময়টা অবকাশ আমাদের—এক-আধ মিনিট যা দাঁড়াতে পাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপ ছাড়ছি।

ও বাবা, ওরে বাবা গো—

সাড়ে-ছ'ফুট জোয়ানপুরুষ লড়াইয়ের সৈনিক মোহন সিং তিড়িং করে হাত তিনেক পিছনে লাফিয়ে পড়ল। জঙ্গলে নানান জন্তু-জানোয়ার—বাঘ দেখল নাকি ? কুড়াল উঁচিয়ে গাইডরা ছুটে এসেছে ঃ কই, কোথায় ?

আঙুল তুলে মোহন সিং গাছের ডাল দেখাল। বাঘ তো গাছে চড়ে বেড়ায় না, হতভম্ব হয়ে গাইডরা ইতি-উতি চায় ।

কোন দিকে ?

দেখ না তাকিয়ে।

কাঁপছে দস্তুরমতো। জলে ভিজে শীত লেগেছে বলেই কি ? বলে, ঐ—ঐ—। ডালে নয়, পাতার উপর ।

পাতায় পাতায় ছিনেজোঁক। এদিকে ওদিকে সর্বত্র ।

জোঁক দেখে অমন চেঁচালে ?

মোহন সিং খিঁচিয়ে ওঠে ঃ বাঘ হলে ডরাব কেন ? এত মানুষ একসঙ্গে, বাঘে আমাদের কি করবে ?

তা বটে ! পর্তুগিজ-বুলেটের আশায় রেলভাড়া করে কাঁহা-কাঁহা মুলুক থেকে আসছি। বাঘকে আমরা থোড়াই কেয়ার করি। জোঁক সর্বনেশে বস্তু। চোরাগোপ্তা আক্রমণ—টেরও পাবেন না, কোনসময় এসে ধরেছে। রক্ত খেয়ে সাবাড় করল—সুড়সুড়ি দিচ্ছে তখন কে যেন, আরাম লাগছে। এ শত্রুর কাছে সামাল হবেন কি করে ? চলাচল বন্ধ করে সর্বাঙ্গ নিরিখ করছি, জোঁক লেগে আছে কিনা। পিঠের জামা তুলে এ-ওকে বলছি, দেখ তো—দেখ তো—

বুড়ো মানুষ সীতারামিয়া—একটা দাঁত নেই, একগাছি চুল কাঁচা নেই। কথা বলতে গেলে কামারের হাপরের মতন ফকফক করে হাওয়া বেরিয়ে আসে। জোঁকের গোলমালের মধ্যে ফাঁক বুঝে তিনি ধপাস করে বসে পড়লেন।

একঢোক জল খাওয়াও ভাই।

এখন জল চাচ্ছেন, তারপরে মিঠাইমেওয়া, রাত্তির হলে আকাশের চাঁদ। পিছনে ঝরনা রেখে এলাম, জলের কথা সেই সময় বলতে কি হল?

ঝরনা লাগছে কিসে? খানা-ডোবায় কত জল! বুড়ো-মানুষটা পিপাসার জল চাচ্ছে, অমন করতে নেই।

বুড়োমানুষ তো ঘরে শুয়ে থাকলেই হয় এসব কাজে আসা কেন?

আজ বুড়োমানুষ, ভায়া। সত্যাগ্রহ এইটুকু বয়স থেকে করছি। গান্ধিজীর সেই চম্পারণ থেকে। কোনও জায়গায় বাদ নেই। এখন তো ও-পাট উঠেই যাচ্ছে। হয়তো বা এই শেষ। অমন করে বলে না— ছিঃ!

একজনের ঘটি চেয়ে নিয়ে আমি জল এনে দিলাম। জল খেয়ে সীতারামিয়ার মেজাজ চড়ল।

চিরকাল বুড়ো ছিলাম না, বুঝলে? সত্যাগ্রহ ক'টা দেখেছ? এ আবার সত্যাগ্রহ নাকি! পুঁচকে একফোঁটা পর্তুগাল, ম্যাপে যার নিশানাই মেলে না। খোদ বৃটিশের সঙ্গে আমরা সত্যাগ্রহ করতাম। রাবণ রাজা সূর্যকে তাঁবেদার করে খাটাত, আর ঐ বৃটিশ-রাজা। সে রাজ্যে সূর্যের অস্ত যাবার এক্তিয়ার ছিল না।

কিন্তু সীতারামিয়ার চেয়েও বেশি মুশকিল চৌধুরিকে নিয়ে। দলপতি তিনি। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে হাঁটু ফুলে ঢোল হয়েছে, কিন্তু এলাকার ভিতর এসে পড়ে এক লহমা থেমে থাকবার জো নেই। কেমন করে কখন খবর বেরিয়ে যাবে—পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। অথবা চুপিসারে নিয়ে পুরবে জেলে। মানুষজন জানবে না, দাগ কাটবে না কারো মনে!

দাড়ানো চলবে না অতএব। চল, এগিয়ে চল। মরে

গেলে শবদেহ নিয়ে তখনও এগুবে। মোহন সিং তড়াক করে চৌধুরিকে কাঁধে তুলে ফেলল।

কি হচ্ছে, অ্যাঁ? এই যাচ্ছেতাই পথে নিজেরাই পার না, এর উপর আমায় বইবে? খানিকটা কাতর হয়ে পড়েছি বলে নেতার কথা মানবে না তোমরা?

মোহন সিং বদ্ধকালা আপাতত। উর্ধ্বশ্বাসে চলেছে। মাইল-টাক গিয়ে চৌধুরি আর্তনাদ করে ওঠেন, নামাও, নামাও—

কী হল হঠাৎ—মর্মান্তিক যন্ত্রণা উঠেছে হয়তো দেহে। ভড়কে গিয়ে মোহন সিং যেমন নামিয়েছে, চৌধুরি এক গাছের গুঁড়ি এঁটে ধরে দাঁড়ালেন। গাছ সুদ্ধ না উপড়ে তাঁকে নড়াতে পারবে না। রাগ করে বলেন, কী খেলা হচ্ছে বল তো আমায় নিয়ে? কাঁধ সুড়সুড় করে তো বুড়োমানুষ সীতারামিয়া মশায়কে কাঁধে তোল।

সীতারামিয়া ঠিক পিছনে। তাঁকে নিয়ে আবার কথা ওঠায় ক্ষেপে উঠলেন: বুড়ো বুড়ো কোরো না বলছি। এ বুড়ো তোমাদের সকলকে শেষ করে তবে মরবে।

সীতারামিয়া সকলের আগে চলে এলেন। এর পরে আর হাঁটা নয়, দৌড়চ্ছেন আগে আগে।

পাহাড় আর জঙ্গলের অন্ত নেই। ঘনতর হচ্ছে ক্রমশ। পথ ভুল হয় নি তো? আমার অবস্থা অতি সঙ্গিন। সকাল থেকে মাথা ছিঁড়ে পড়ছে—আর পারি না, টলে পড়ে না যাই! সীতা-রামিয়া ও চৌধুরির গতিক দেখে ভয়ে ভয়ে কাউকে বলি নি। মোহন সিং কিন্তু সন্দেহ করেছে, কটোমটো তাকাচ্ছে। ফাঁকা কাঁধে অসুবিধা হচ্ছে বোধহয় তার। শনির দৃষ্টির আড়ালে সরে যাই তাড়াতাড়ি। একেবারে সকলের পিছনে।

এক গাইডের মুখ-ভরা বিপুল গোঁফ-দাড়ি। দাড়ির জঙ্গল দেখে কে যেন দণ্ডকারণ্য বলেছিল—লোকটাও সেই থেকে দণ্ডক-ভাই।

তার সঙ্গে গল্প জমিয়েছি, মাথাধরার কথা তারও কাছে ভাঙি নি। যেন গল্পের দরুনই পিছিয়ে পড়ছি আমরা।

গ্রাম কতদূর দণ্ডক-ভাই ?

আধ মাইল।

অধীর কণ্ঠে বলি, ঐ এক কথাই তো কখন থেকে বলছ।

দণ্ডক-ভাই গম্ভীর হয়ে বলে, দু-কথার মানুষ আমি নই।

আরও ঘণ্টা দুয়েক কায়ক্লেশে চলবার পরেও সেই আধ মাইল। পিছিয়ে পড়েছি—পাহাড়ের বাঁকে আগের মানুষদের অনেকক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। ধুঁকতে ধুঁকতে এক পাথরের উপর বসে পড়লাম। জিরিয়ে নিই একটু। আর পারছে নে।

কপালে হাত ছুঁইয়ে দণ্ডক-ভাই শিউরে উঠেঃ জ্বর ধাঁ-ধাঁ করছে। এতক্ষণ পেরেছ কী করে, সেই তো অবাক লাগে।

ব্যাকুল হয়ে বলি, কী হবে তা হলে ?

দণ্ডক অভয় দেয়, জিরিয়ে নাও না। কুছ পরোয়া নেই। ওরা পাকদণ্ডী ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। চড়াই ধরে সোজাসুজি আমি নিয়ে তুলব।

তবে তাই। আমার সঙ্গে থাক তুমি। ওদের দলে ভিড়ো না।

দণ্ডক ঘাড় নাড়লঃ বেশ তো! কিন্তু ওদের জানিয়ে আসা দরকার। তোমায় না দেখতে পেয়ে ফিরে আসে যদি! পৌঁছুতে তা হলে দেরি পড়ে যাবে। এক ছুটে আমি বলে আসছি।

হনহন করে চলল। পিছন থেকে বলে দিই, দেরি কোরো না ভাই। যাবে আর ফিরে আসবে।

মুখ ফিরিয়ে সে বলল, আধ ঘণ্টা। উঁহু, অতও নয়। বসে থাক তুমি, জিরিয়ে নাও।

আধ মাইলের পিছন ছুটছি সকাল থেকে, আবার এই আধ ঘণ্টার ফেরে পড়লাম। সন্ধ্যা হয়ে আসে, তখন আর বসে থাকতে

পারি না। ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছি: দণ্ডক, দণ্ডক-ভাই! কাকস্য পরিবেদনা! পাহাড়ের গায়ে গায়ে ডাক ঘুরে বেড়ায়। সর-সর করে মস্ত এক সাপ সরে গেল গেল পথের পাশ দিয়ে। কপাল-ক্রমে এটি ভদ্রস্বভাবের, নির্গোলে তাই সরে গেল। ফোঁস করে ফণা তুলতেও পারত। তখন খেয়াল হল, চেঁচামেচি ঠিক হচ্ছে না আর এখন। ঘোরাঘুরিও উচিত নয়। বনের বাসিন্দা ওঁরা, সারাদিন ঝিমিয়ে থাকেন, ফুর্তি-ফার্তির সময় এবারে। সুমুখ-আঁধারি রাত, তার উপর ঘনপত্র গাছের ছায়া—অন্ধকার নিবিড় হল দেখতে দেখতে। গাছে উঠে পড়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। জ্বরে হাঁসফাঁস করছি, পুরোপুরি চেতনা আছে তা-ও মনে হয় না। তবু কিন্তু বুদ্ধি এসে গেল—কোমরের গামছাখানা পরে ধুতি দিয়ে সর্বদেহ আষ্টেপিষ্টে বাধলাম ডালের সঙ্গে। আরও জ্বর বেড়ে একেবারে বেহুঁশ হয়ে গেলেও ভূঁয়ে না পড়ি।

সে রাত্রে পশ্চিমঘাটের পর্বত-সানুতে উৎসব পড়ে গেল। দিনের ঘুম ভেঙে অরণ্য জেগে উঠেছে। হাওয়া দিয়েছে, পাতায় লতায় ফিসফিসানি আওয়াজ। কল-কল করে জল নামছে কোথায়। জন্তু-জানোয়ার ছুটোছুটি করছে ছায়ান্ধকারে, বনের অন্ধিসন্ধিতে—ভারি মজার লুকোচুরি খেলা। শহুরে মানুষ আপনাদের এ-বস্তু আন্দাজে আসবে না। রাত্রিচর পাখি আকাশের গায়ে কাল কাল রেখা টেনে ছুটোছুটি করছে, বুনো ফলের লোভে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অদূরের কোন গাছে। সারা বনের সমস্ত ডালপালা ভরে জোনাকিরা আলো সাজিয়েছে। কত জানোয়ারের কত রকম ডাক—কচি গলার কান্নার মতন, খলখল করে হেসে ওঠার মতন। বাঘের হামলা এক একবার তাড়া দিয়ে সব থামিয়ে দিচ্ছে। জ্বরটা আরও বেড়েছে, আধেক ঘুম আধেক জাগরণে চারিদিক বিচিত্র লাগে। ভয়ও হচ্ছে। বনভূমের নতুন মানুষ আমি—বাসিন্দাদের কারো নজরে না পড়ি, অতিথিকে উৎসবে টেনে নামিয়ে না নেয়।

ভোরের আলোয় আবার সব নিঃশব্দ। রঙ্গালয়ে পট পড়ে গেছে। কে বলবে অত কাণ্ড চলেছিল রাত্রে! গাছ থেকে নেমে এসেছি। চারিদিক এখন মরা। জ্যান্ত মানুষ খুঁজে বেড়াই—কোথায় জনপদ, কোথায় মানুষ! বন্ধু হও শত্রু হও—মানুষ কেউ যদি থাক, কথা বলে ওঠ। দগুক সেই ছুতো করে ভেগে পড়ল। দোষ দিই নে—একটা দিনের চেনা রোগি নিয়ে পড়ে থাকতে যাবে কেন? অরণ্যে চিৎকার করে বেড়াই: কে আছ গো, কে আছ?

জ্বর থাকার দরুন ক্ষিধেটা নেই। তেষ্টা আছে, ঝর্ণাও তেমনি পায়ে পায়ে। ঝর্ণায় নেমে আঁজলা ভরে জল খাই। বিকালের দিকে এমন সুবিধাটাও গেল। কড়া উপোসের ঠেলায় জ্বর কায়দা হয়ে আসছে; এবং তারই উপসর্গ—চনমন করছে পেট। কি খাই, কি খাই? লতায় লতায় লাল টকটকে ফল ফলে আছে এক রকম। একটা ছিঁড়ে মুখে দিয়েছি—বাপরে বাপ, কী উৎকট তিতো! থুঃ থুঃ—। আবার ভাবছি, কুইনাইন জ্বরের অষুধ—মুখে দিয়েছি তো গিলেই ফেলি, জ্বর যেটুকু আছে ছেড়ে যাবে। ফল খোঁজা-খুঁজিই চলল তারপরে। আমের কাছাকাছি এক ফল—আঁটি খুব মোটা, কিন্তু মিষ্টি। কোঁচড় ভরে সেই ফল পেড়ে নিচ্ছি—

মহিষ যেন একটা! গ্রাম তবে নিকটেই। দড়ি ছিঁড়ে মহিষ এসে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। উঠি-কি-পড়ি ছুটেছি সেদিকে। একটা নয়, পিছনে আরও আছে। বিস্তর মহিষ, সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাল সবগুলো। সে নজর ভাল ঠেকে না—হিংস্র, ভয়ঙ্কর। কী সর্বনাশ, বুনো মহিষের দল। একটা বড় গাছের গুঁড়ি ঠেশ দিয়ে দেখছিলাম, ফনফন করে উঠে পড়লাম। এই কাজটা খুব ভাল পারি। যতক্ষণ নিচে ছিলাম, মহিষগুলো তাকিয়ে ছিল স্থির চোখে। উঠছি দেখে তীরের বেগে ছুটে এল। লতাপাতা ছিঁড়েখুড়ে আসছে, মাটি উঠছে খুরের ঘায়ে। এসে করল কি—গাছে ঘা মারছে শিং দিয়ে। এদিক দিয়ে মারছে, ওদিক দিয়ে

মারছে। এই প্রকাণ্ড গাছ কাঁপছে থর-থর করে। আর আমি জোঁকের মতন লেপটে আছি ডালপাতার ভিতরে। আছি কি নেই, বোঝা যায় না। অনেকক্ষণ হাঁকডাক ও লড়ালড়ি করে মহিষেরও বোধকরি সেই সন্দেহ হয়—গাছে নেই, ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে। অন্ধকার হল, ধীরে ধীরে বনান্তরালে চলে গেল দুশমনগুলো। নির্জন বনে আরও একটি রাত্রি আমার। কোঁচড়ের সেই ফল খাচ্ছি, আর আঁটি ফেলছি ছুঁড়ে ছুঁড়ে....

গাছের চূড়া থেকেই দেখে নিয়েছি সরু এক জলধারা। নদী পেয়ে গেছি, এ নদী ছাড়ব না কিছুতে। উত্তাল স্রোতে জল চলেছে, কিনারে কিনারে চলেছি আমি। নদী নিশ্চয় জনপদে নেমে গেছে—যেখানে গ্রাম আছে, মানুষ আছে। পায়ে-চলার পথ একটু যেন? বর্ষার শ্যামল ঘাসের উপরে পায়ের দাগ—কোন মানুষ হেঁটে চলে গিয়েছে। ঈশ্বর, চিহ্নটুকু না হারায় যেন কোন রকমে! খানিকটা গিয়ে পদ-চিহ্ন নদীর জলে নেমে গেল। অতএব পার হয়ে গেছে সেই মানুষ। পাহাড়ে-নদী, জল অল্প। পাথরের চাঁই মাঝে মাঝে মাথা জাগিয়ে আছে। সেই পাথরে পা রেখে রেখে—বুঝে দেখুন আমার অবস্থা, পেটে ভাত নেই, জ্বরে পিশেছে দু-দিন ধরে—পাথরে পা রেখে রেখে নদী পার হচ্ছি। একবার টাল সামলানো গেল না, জলে পড়ে গেলাম। উপুড় হয়ে পড়েছি। আর যাবে কোথায়—করাল স্রোত নুড়ির মতন গড়িয়ে নিয়ে চলল। মিনিট দুয়েকে মাইল খানেক গেছি অন্তত। প্রাণের ভয়ে আঁকুপাকু করছি, হাত বাড়াচ্ছি এটা-ওটা ধরবার জন্য। ধরে ফেললাম গোড়া-আলগা এক গাছের শিকড়। শিকড় ধরে ঝুল খেয়ে ডাঙায় উঠলাম। বিষম কষ্ট হয়েছে, কষ্টের চোটে গড়িয়ে পড়ি সেইখানে।

তারপরে সামলে নিয়ে চোখ মেলে দেখি, নারকেলের ছোবড়া। নারকেল হলে ভাবতাম জলে ভেসে এসেছে। ছোবড়া মানুষের হাতে

ছাড়ানো, মানুষ আছে তবে কাছাকাছি। আমার অবস্থা, ঐ ছোবড়া হাতে নিয়ে এক পাক নেচে নেবার মতন। সোনার তাল পেলে মানুষে অমন করে না।

আর কয়েক পা গিয়ে—সৌভাগ্যের অন্ত নেই—পোড়া কয়লা। রান্নাবান্না করে গেছে, ছেঁড়া কলাপাতা পড়ে আছে। কাঁঠালগাছ দেখা গেল, বিস্তর কাঁঠাল ফলেছে। তারপর ক্ষেতখামার—পুরুষ-মেয়ে চাষবাস করছে। আহা রে, মানুষ দেখে চোখ জুড়াল! বেড়া-ঘেরা বাগ-বাগিচা— নারকেল-বাগান, কাঁটালগাছ, কলাবাগান। তার পিছনে খোড়ো ঘর—পূর্ব বাংলায় কলাবাগানের মধ্যে ঠিক যেমনধারা ঘর দেখতে পান।

এক বাড়ি ঢুকে পড়লাম। ভর দুপুর, তা বুঝবার জো নেই—আকাশ থমথম করছে মেঘে। মেয়ে-পুরুষ কাউকে দেখছি নে—ঐ যা দেখে এলাম, ক্ষেতে গিয়েছে বোধহয়। শুধু বাচ্চার দঙ্গল। ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে। কাকে কি বলি, কে আমার কথা বুঝবে? তা খাবার না জুটল, কোলে তুলে ধরি তো একটা-দুটোকে। হল না—দুড়দাড় করে সব পালাল।

বৃষ্টি এল। ফুল-লতাপাতায় এক বাড়ির ফটক সাজিয়েছে। আটচালা মতন টিনের ঘর—মানুষজন গুলতানি করছে—বৃষ্টি বাঁচাতে তাদের দাওয়ায় উঠে পড়লাম। পুরুষ আছে, মেয়ে আছে। সঙ্কুচিত হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছি, ক'জনে এগিয়ে এল।

কে তুমি?

চুপ করে আছি। মোম দিয়ে গোঁফ-মাজা—উনিই বাড়ির কর্তা বলে ঠেকছে—গর্জন করে উঠলেন: সত্যাগ্রহী নাকি তুমি? ঠিক করে বল।

চাট্টি খেতে দেবেন আমায়?

বেরোও, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাও বলছি—

দাঁড়িয়ে ছিলাম, বসে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে। সত্যাগ্রহের মহড়া দিয়ে নিই অভদ্র লোকটার কাছে।

যাবে না ?

বৃষ্টি ধরুক—

ধরুক না ধরুক, যেতেই হবে তোমায়। এক্ষুনি।

মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে ছাঁচতলায়, জল গড়িয়ে নয়ানজুলিতে জমছে, ঝিলিক দিচ্ছে আকাশে—মুগ্ধ হয়ে আমি এই সব স্বভাবের শোভা নিরীক্ষণ করছি।

শুনতে পাচ্ছ না ?

কিন্তু কোন অজুহাত মানল না। ঘাড় ধাক্কা দিল লোকটা। ক্লান্ত রোগা শরীর—উঠানে গড়িয়ে পড়লাম বৃষ্টি-জলের মধ্যে। এর পরেও রেহাই নেই—দাওয়ার ধারে এসে হুঙ্কার দিচ্ছে ঃ ছুতো ধরে পড়ে থাকলে হবে না। ওঠ্—উঠে পড়্ বলছি।

মরি, সে-ও ভাল—এই ছ্যাঁচড়া জায়গায় তিলার্ধ আর নয়। টলতে টলতে বেরুলাম। শরীরের সঙ্গে মনও দুর্বল হয়ে গেছে। চোখ ফেটে জল বেরুবার মতো। হায় রে, এই মানুষ এরা সব ! বদনাম শুনি পর্তুগিজ পুলিশ ও সৈন্যের সম্পর্কে। সে প্রভুদের সঙ্গে কখন মোলাকাত হবে জানি নে। কিন্তু এদের কাণ্ড দেখে রি-রি করে জ্বলছে সর্বাঙ্গ। বেরিয়ে পড়েছি, তবু ছাড়ে না। ঐখান থেকে চেঁচাচ্ছে, গুণে গুণে পা ফেলছিস—চলে যেতে মন সরে না বুঝি ?

কড়া সুরে জবাব দিই ঃ সরতে চাইছে না পা। দু-দিন খাইনি, অসুখ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের জানানো মিছে। বরঞ্চ জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে থাকব, তোমাদের মতন মানুষের কাছে নয়।

আবার চোপরা করে—যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা !

দুই বীরপুরুষ সেই বৃষ্টি-জলের মধ্যে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল। হাতে লাঠি। লাঠি উঁচিয়ে বলে, এত জায়গা থাকতে এখানে মরতে এসেছে ! গ্রাম-ছাড়া করে দিয়ে আসব তোকে।

রাগে রাগে পা ফেলছিলাম—অতঃপর প্রাণের আতঙ্কে দস্তুর-মতো ছুটতে আরম্ভ করেছি। ঐ লাঠির এক ঘা যদি বসিয়ে দেয়,

ওদিক তাকিয়ে সন্তর্পণে ঝাঁপের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। পিছনে আমি। অন্ধকারে চোখ জ্বলে যেন তার—আমি কিছু দেখছি না, ওরই মধ্যে একটা কোণে নিয়ে গিয়ে বলে, ভাল কপাল তোমার। এতখানি শুকনো ফাঁকা জায়গা। বস, আরাম করে বসে পড়—

বসিয়ে দিয়েই বেরুচ্ছে। আস্তে আস্তে বলি,একটু যদি জল পাওয়া যায়—

ভীমরাও থমকে দাঁড়াল : রাত্তিরটা জল খেয়ে কাটাবে? চটে আছ গাঁয়ের উপরে—জল খেয়ে পড়ে থাকবে, অন্নগ্রহণ হবে না। এত বড় দুর্বাসা মুনি, তবে এসব কাজে কেন এসেছ শুনি?

এবং মিনিট দশেকের ভিতরে থালায় করে ভাত ডাল আর কি-একটু তরকারি নিয়ে এল। আলো নেই—এসব হাত ঠেকিয়ে বুঝে নিচ্ছি। বলে, অন্ধকারে খেতে হবে। কেরোসিনের যা দর, এমনিই তো কত মানুষ আলো জ্বালে না। কোন লাটসাহেব হে তুমি, একটা রাত আঁধারে কাটাতে পার না?

ভাগ্যিস অন্ধকার! আমার অবস্থা তাই দেখতে পেল না। দেখলে নির্ঘাৎ হেসে ফেলত। অথবা কান্না আসত। ভাত এমন বস্তু, আগে কখনো ভাবতে পারি নি। কিন্তু হলে কি হবে—দু-গ্রাস পেটে না পড়তে নাড়িভুড়ি অবধি পাক দিয়ে উঠল। যেটুকু ভিতরে গেছে, দশ গুণ অন্তত হড়হড় করে উগরে দিলাম। বিশ্বভূবন বনবন করে পাক খেতে লাগল। তারপরে আর কিছু জানি নে····

•

চেতনা ফিরলে দেখি, একা ভীমরাও নয়—আর-একটা মেয়ে এসে জুটেছে। অন্ধকারে চেহারা দেখতে পাই নে, ঝিনমিন গয়না বাজিয়ে সেঁক দিচ্ছে আমার হাতে পায়ে। গোয়ালের সাঁজালের আগুন ভীমরাও হাতপাখার বাতাস দিয়ে দিয়ে গনগনে করে তুলেছে। এত সেঁকছে, শীত যায় না তবু। সর্বদেহে কাঁপুনি। লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই, ভয়ও হচ্ছে। উঠে বসতে যাই।

সেরে গেছি আমি। আর দরকার নেই। তোমরা চলে যাও।

ভীমরাও বলে, যাব তোমার হুকুমে নাকি? উঠো না বলছি, ভাল হবে না। উঃ, কম জ্বালান জ্বালিয়েছ! এই ননীর দেহ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোও কোন আক্কেলে?

স্বর নামিয়ে মেয়েটাকে বলে, দুধটা এইবারে খাইয়ে দাও। দেখ তো, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোধ হয় এতক্ষণে।

জবাব না দিয়ে মেয়েটা দুধের বাটি আগুনের উপর ধরল। চুড়ি-পরা নিটোল হাতের একটুকু। আসল রং ঠিক জানি নে, আগুনের আঁচে গৌরবরণ দেখাচ্ছে।

ভীমরাও বলে, দুধ খেয়ে নাও—চাঙ্গা হবে। বমি করে জায়গাটা নোংরা করে ফেলেছ, দু-খানা বেঞ্চি জুড়ে খাট বানিয়ে দিচ্ছি। আমি বেটা কাঁধে বয়ে বেঞ্চি এনে দিই, উনি তার উপর শুয়ে শুয়ে পা দোলান।

বেঞ্চি আনতে ভীমরাও কোন দিকে চলে গেল। মেয়েটি এবার কথা বলে ওঠে। সহজ হিন্দি—আর কী মিষ্টি গলা! বলে, সত্যাগ্রহী, দুধটুকু খাও। আমায় আশীর্বাদ কর। আজকের দিনে তুমি রাগ করে থাকলে সুখশান্তি হবে না আমার জীবনে।

চমক লাগে, এমন কথা বলে কেন? বলছে, বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল, সেই থেকে তোমার খোঁজ করছি। চুরি করে এসেছি মাপ চাইবার জন্য। বাড়ির কেউ জানে না। আমার এমন দিনে, সত্যাগ্রহী, তুমি রাগ করে থেকো না।

বিয়ের কনে এই? কোন গতিকে একটু আলো এসে পড়ত এই গোয়ালঘরে—করুণাময়ীকে দেখে নিতাম। কেমন চেহারা জানি নে। কপালে জ্বলজ্বল করছে সিঁদূরের ফোঁটা? বিয়ের কনে কেমন সাজ করে এদের দেশে? গয়না তো বাজছে, কোন কোন গয়না পরে এসেছ ওগো কন্যে?

একটু পরে বেঞ্চি ঘাড়ে ভীমরাও এসে পড়ল। বলে, দুধ খাওয়ানো হয়ে গেছে? বাঃ বাঃ! এবারে বাড়ি যাও তুমি, বেশিক্ষণ এখন বাইরে থাকে না। দুধ নিয়ে এসে খুব ভাল কাজ করেছ, বুদ্ধির কাজ করেছ।

খাইয়ে-দাইয়ে ওরা চলে গেছে। একলা আমি,—আর গরুগুলো। মশা হয়েছে—গরু পা দাপাচ্ছে। আমিও এপাশ-ওপাশ করছি মশার কামড়ে। স্বপ্নের মতো লাগে—নরম হাতে কতক্ষণ ধরে মেয়েটা সেঁক দিল, আর শিশুর মতন মাথাটা তুলে ধরে দুধ খাইয়ে গেল।

অনেক রাত্রি। ভারী বুটের আওয়াজে চোখ মেললাম, ঘুমের ভাব কেটে গেল। বুটজুতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোয়ালঘরের কানাচে। পুলিশ টের পেয়ে গেছে। দরমার বেড়ার এক জায়গায় ফাঁক—টর্চ ফেলছে সেখান থেকে। টর্চের আলো মুখের উপর পড়েছে। আমার ঘুম ভাঙে না কিছুতে, মরে ঘুমুচ্ছি। দুমদাম লাথি পড়ছে। দরজার ঝাঁপ ছিঁড়ে পড়ে গেল। খুঁটি বেয়ে টকাটক উঠে পড়ে চালের বাতা খুঁজছে —কি খুঁজছে বলুন তো? বোমা-রিভলবার সেরেস্থরে রেখেছি কিনা। আর জন চারেক ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমায়। বন্দুক তাক করা। গণ্ডগোল করেছি কি দেহের চার জায়গায় একসঙ্গে ছিদ্র করে দেবে। পা তুলে মারল এক বুটের লাথি। গড়িয়ে পড়লাম উল্টো দিকে। সেদিক দিয়ে মারল আর একজন। কী ভয়ানক ঘুম বুঝুন, ঘুম আমার কিছুতে ভাঙে না। শেষটা চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করিয়ে চোখের পাতা জোর করে খুলে দিল। না জেগে আর উপায় কী?

কে তুমি?

আমি সত্যাগ্রহী—

এদিক দিয়ে ঠাঁই করে এক চড় তো ওদিকে মুখ ঘুরে যায়। ওদিককার চড়ে মুখ আবার সিধে হয়। শেষটা আর নিয়ম নেই —এলোপাথাড়ি মারছে কিল-চড়-ঘুসি।

কত জন এসেছ তোমরা, তারা সব কোথায় ?

আবার চোখ বুঁজেছি আমি। ঘুম ধরেছে, শুনতে পাই নে। হাতে কুলোয় না তখন—লাঠি বের করল। বাঁশের ও রবারের ছোট ছোট লাঠি। শেষটা টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলল অন্য এক জায়গায়।

রাতে ভাল ঠাহর হয় নি—সকালবেলা দেখতে পাচ্ছি, সেই গোয়ালের মতন খোড়োঘর নয়, পাকা দালান। দালান পাকাই বটে—তবে এ দালান যখন বানিয়েছিল, অনুমান করি, পর্তুগিজরা তখনো এসে জোটে নি। আজকে উজ্জ্বল রোদ, কিন্তু কালকের বৃষ্টির জল টপটপ করে চুইয়ে পড়ছে ছাত থেকে। বৈশাখ মাসে পুণ্যার্থীরা তুলসীগাছে ঝারি বসান, আমার সর্বাঙ্গে তেমনিধারা জলের ঝারি ঝরছে।

ন'টা নাগাত দরজার তালা খুলে ডাকল : বাইরে এস সত্যাগ্রহী।

ফাঁড়িতে নিয়ে এসেছে। সাইনবোর্ডে পাচ্ছি, বিচুলি জায়গাটার নাম। আফিসের বড় বারান্দায় পুলিশরা বসে। সেখানে নিয়ে দাঁড় করাল

কি ঠিক করলে, বলবে সব কথা ? দেখ, চুপ করে থেকে পার পাবে না। মুখ দিয়ে কথা না বেরোয় তো জিভ ছিঁড়ে বের করব। যা জান, বলে যাও।

হুঁ।

বর্ডারে নিশ্চয় অনেক সত্যাগ্রহী দেখে এলে ?

হুঁ।

উৎসাহ ভরে একজনে খাতা বের করে নিল।

কত হবে ? আন্দাজেই বল না হে ! কোন্ পথে আসছে তারা ? কুচকাওয়াজ হচ্ছে শুনলাম ওদিকে—সত্যি ?

হুঁ।

আরও চলল কিছুক্ষণ। শেষটা খাতা ছুঁড়ে দিয়ে লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

তার পরে—এক কথা কাঁহাতক বলি, বিরক্ত হচ্ছেন আপনারা। দিন পাঁচ-ছয় কেটে গেল। সেলে আটক থাকি, সকালবেলা বারাণ্ডায় নিয়ে নিয়মিত ডলাই-মলাই করে। দিনে রাতে দু-খানা পাউরুটি ও দুই গ্লাস জল বরাদ্দ। বেরুতে দেবে না। ঘরের মধ্যেই নোংরা হচ্ছে, তা বলে উপায় নেই।

এক বুড়ো পুলিশের উপর তদারকের ভার। লোকটি খৃস্টান, কথাবার্তায় সেটা টের পেলাম।

গোয়া ইণ্ডিয়ার মধ্যে ঢুকে গেলে তো গির্জা ভাঙবে তোমরা। পৈতে পরিয়ে আমাদের পূজোয় বসিয়ে দেবে।

ইণ্ডিয়ায় লাখো লাখো গির্জা। গিয়ে দেখগে যাও। আর বিশ পুরুষ ধরে যাদের পৈতে, তারাই সব হেলায় এখন পৈতে ফেলে দিচ্ছে।

একদিন লোকটা জিজ্ঞাসা করে, ভাইবোন ক'টি তোমরা ?

একলা।

বিয়ে করেছ ?

না।

মা-বাপ বর্তমান আছেন ?

মা ছোট্ট বয়সে মারা যান। বাবা আছেন—বয়স হয়েছে, নড়তে চড়তে পারেন না।

আচ্ছা পাষণ্ড তো বুড়ো ! ছেড়ে দিলে কোন্ প্রাণে ?

না বলে চলে এসেছি।

আসবে বই কি ! এমনি ধনুর্ধর ছেলে তোমরা আজকাল। এত যে সাজা পাচ্ছ, বাপের মনে কষ্ট দিয়েছ তারই ফল। বেশ হচ্ছে, আমি বড্ড খুশি।

চটেমটে চলে গেল। কিন্তু মজা হল তারপর। আস্ত

পাউরুটি এখন কেটে কেটে এনে দেয়। এক গাদা, খেয়ে শেষ করা যায় না।

তাই একদিন বললাম, ক'টা রুটি কাট তুমি ?

একটা। তাই হুকুম হয়েছে, বেশি দিয়ে কোন্ ফ্যাসাদে পড়ব। শকুনের চোখ ঘুরছে চারিদিকে।

একটা রুটির এতগুলো টুকরা ?

রুটিটা বড় ছিল। একখানা করেই দিতে বলেছে, কী ওজনের হবে বলে দেয় নি তো !

ঠাহর করলাম, রুটির টুকরোয় চিনি ছড়ানো। মাখনের মতো কি একটু লাগানো, এমনও সন্দেহ হয়। আর একদিন জানালার গরাদে দিয়ে কাগজে জড়ানো খানিকটা ভাজি এসে পড়ল।

ছয় দিনের দিন যথারীতি সেই বারাণ্ডায় দাঁড় করিয়েছে। আজকে বেশি জমজমাট। বারাণ্ডা ভরে গেছে। লালচে-মুখ পর্তুগিজ আছে, কটকটে কালো নিগ্রো আছে—গোয়ার দেশি লোকেরা তো আছেই। একটা নতুন লোক—সাজপোশাকে অফিসার মনে হয়—কোমল স্বরে শুভার্থীর মতন বলে, এত কষ্ট করে লাভটা কি হবে বলতে পার ? গোয়া ভারতে গেলে নেহরু আর সাঙ্গোপাঙ্গদের মজা। তোমাদের নামও কেউ জানতে পারবে না।

ঘাড় নেড়ে সায় দিই ঃ আমার নাম আবার জানতে যাবে কে ?

বোঝ তবে। খবরাখবর বল দিকি সমস্ত। টাকা পাবে, আমোদ-স্ফূর্তি পাবে। এমন স্ফূর্তি—যা তোমাদের ধারণায় আসে না। যে রকমটা চাও। বন্ধু হলে আমরা তাকে বড্ড খাতির করি।

বটেই তো !

পুলকিত পর্তুগিজ অফিসার আমার দিকে ও সকলের দিকে চেয়ে হাঁক ছাড়ল ঃ বল সবাই সালাজার জিন্দাবাদ !

সবাই তাই বলল। আমার ক্ষীণ কণ্ঠে কেবল ভিন্ন রকমঃ ভারত জিন্দাবাদ!

অফিসারের ফরশা মুখ কাল হয়ে গেছে। পাশের একজন বলে, এই শয়তানি চলছে এদ্দিন ধরে। একখানা কাঠই শুধু—মানুষ নয়। শুকনো কাঠখানা আমরা পাহারা দিয়ে মরছি। কিম্বা হয়তো কোন মন্তোর জানে। আমাদের হাত ব্যথা হয়ে যায়, ওর গায়ে লাগে না।

আমি তখন বলি, কেন এঁদের হাতের কষ্ট দেওয়া? পাঞ্জিমে পাঠিয়ে দিন, বিচার হোক।

অফিসার বলে, অদ্দূর যেতে হবে না। বিচার আজ এখানেই। বিচারের জন্যে এসেছি।

বলিদানের আগে যেমন পাঁঠা পাছড়ায়, জনকয়েক তেমনি করে ধরল আমায়। চকচকে ক্ষুর বের করল। গলায় বসিয়ে দিয়ে জবাই করবে? আপনারা ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু কেমন রোখ চেপে গেছে—আমি তখন জীবনে বীতস্পৃহ একেবারে। ইচ্ছে করেই তো মরতে এসেছি।

না, গলা কাটল না। খরখর করে ভ্রুর অর্ধেকখানি কামিয়ে ফেলল। মাথার এখানে ওখানে খোচা খোঁচা চুল তুলে নিচ্ছে। হাসছে সকলে হো-হো করে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে। বলে, চুল তুলে নিলাম—তা রাগ কোরো না, কালো রঙে মিলিয়ে দিচ্ছি আবার—

আলকাতরা ঢালল মাথার সেই সব জায়গায়। দেখছে মাথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—শিল্পবস্তু মানুষে যেমন করে দেখে। বলে, খাসা দেখাচ্ছে—চমৎকার! এবারে কান ছুটো। ছুটো কান কেটে নিয়ে ছেড়ে দেব তোমায়।

ক্ষুর ধরে সত্যি সত্যি কানে পোঁচ দিতে যায়। ছু-হাতে কান চেপে ধরে মাথা ঘোরাচ্ছি এদিকে-ওদিকেঃ গলা কেটে ফেল আমার। সেই ভাল। কান ছুঁতে দেব না।

অফিসার লোকটা সদয় হয়ে তখন বলে, যাকগে,—যাকগে। দুটো কানের দরকার নেই, একটাতেই হবে। একটা নিয়ে নাও, আর একটা ওর থাক। কাটা-কান ইণ্ডিয়ায় পাঠাব—এর পরে যারা আসছে, বুঝেসমঝে আসে যাতে।

বিষম হুটোপাটি। গায়ে আমার অসুরের বল এসেছে। মানুষগুলোকে ঘা-গুঁতো দিয়ে ছিটকে নেমে পড়লাম। তখন মরীয়া। মারুক কাটুক—তার আগে শুনিয়ে যাই, যে জন্য এত কষ্ট করে এত পথ এসেছি। পতাকা নেই আমার সঙ্গে—মুখে মুখে চেচাঁচ্ছি : ভারত জিন্দাবাদ ! ছুটে বেড়াচ্ছি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে : ভারতের জয় হোক—তোমাদের আমাদের সকলের ভারত।

ধর্‌ ধর্‌—

কতক্ষণ পারব ? জাপটে ধরেছে আবার। অফিসার বজ্রকণ্ঠে হুকুম দেয়, পায়ের তলা চিরে দাও। হেঁটে হেঁটে জন্মে আর সত্যাগ্রহে না আসতে পারে !

* * *

সত্যাগ্রহী শিরিষ-কাগজ ঘষছিলেন আলমারিতে। পালিশ হবে। কাগজ রেখে পা তুলে ধরলেন আমার দৃষ্টির সামনে। বললেন, পা দেখাচ্ছি—কিছু মনে করবেন না। নয়তো ভাবতেন, বেটা গালগল্প চালিয়ে গেল। পুঁজ হয়েছিল, সেই অবস্থায় সীমান্তে এনে এক রকম ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দিল এপার-মুখো।

ঘা শুকিয়ে গেছে, তবু গা ঘিনঘিন করে ওঠে। পায়ের তলায় লম্বালম্বি আড়াআড়ি অগুন্তি সরলরেখায় জাল বুনে গিয়েছে।

সত্যাগ্রহী বলেন, হাঁটতে পারি নে। জুতো পায়ে হাঁটতে গেলেও পা টনটন করে। তাই এই বসা কাজ ধরেছি। কাজটা ভাল। খাটনির কিছু নয়, দিন গেলে তিন-টাকা চোদ্দ-সিকে রোজগার।

বাদাবন

প্রমথ হালদার লাট কুড়ুলতলা থেকে ফিরছিলেন।

একটা জঙ্গল জরিপ হচ্ছে। সরকারি বোটখানা নিয়ে চৌধুরি সাহেব অনেক দূরে সুপতি অঞ্চলে বেরিয়ে গেলেন, এঁরা ডিঙায় আসছিলেন তাই। চৌকিদার ও মাঝিমাল্লারা জন আষ্টেক সঙ্গে। আর আছে বন্দুক, সড়কি, হেঁসোদাও। ভাঁটার খরস্রোতে দুলে দুলে বাদারাজ্যের রাজচক্রবর্তী সম্রাটের মতো প্রমথ যাচ্ছিলেন।

তিনখানা বোঠে পড়ছিল। হাতের ইঙ্গিতে সহসা প্রমথ তাদের থামতে বললেন। তামাক খাচ্ছিলেন, হুঁকো নামিয়ে মাঝিকে ফিস-ফিস করে নির্দেশ দিলেন হালটা আলগোছে ছুঁয়ে রাখতে জলের উপর—যাতে কোন রকম শব্দ-সাড়া না হয়। কূল ঘেঁসে ধীরে ধীরে ডিঙা এগুতে লাগল।

পাড়ের মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে। মাটি আর কোথায়—বলাঝোপ, গোলবনের শিকড়, শূলো। দোয়ানিয়ার মুখে এল। প্রমথ বাঁ-দিকে আঙুল বাড়ালেন। অর্থাৎ ঢুকতে হবে ঐ দোয়ানিয়ায়।

মাঝি চরণদাস ঘাড় নাড়ে। সে-ও পুরানো লোক। এত উজান কেটে নৌকা তোলা দুষ্কর তো বটেই—তা ছাড়া দোয়ানিয়ার দু-মুখ দিয়ে অতিদ্রুত জল নামছে, নৌকোর তলি এখনই বসে যাবে নোনাকাদায়। তখন জোয়ারের অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। গরম বাদা, জনমানবহীন। প্রমথর হাতে টোটার বন্দুক আছে যদিচ, তবু ও-জায়গায় অতক্ষণ ঐভাবে নিশ্চল হয়ে থাকা ঠিক হবে না।

প্রমথ প্রণিধান করলেন। ভেবেচিন্তে ঐখানে খালের মুখে ডিঙি রাখতে বললেন। চৌকিদার কালীপদকে প্রশ্ন করেন, শুনতে পাস?

কালীপদ কান খাড়া করল। এক ধরনের মৃদু আওয়াজ আসছে এপার ওপার দু-দিক থেকে। বলে, বাঁদর—

ঠিক বলেছিস। থেমে আবার একটু শুনে নিয়ে প্রমথ বললেন, হুঁ, বাঁদরই।

ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন। তারপর বলে উঠলেন, এই—এইবার?

কু দিচ্ছে। বাঁদর ছাড়া আর কি!

প্রমথ বিরক্ত হয়ে বললেন, কান দিয়ে শুনিস তোরা, না কি? আসল-বাঁদর আর নকল-বাঁদরে তফাৎ ধরতে পারিস নে?

কালীপদর কাছে সাধারণ বানরের ডাক—কিন্তু প্রমথ নিঃসংশয় ভাবে বুঝেছেন, মানুষই বানরের মতো ডাকছে। গাছাল দিচ্ছে মানুষ। এবং এ মানুষ—সঠিক বলা চলে না যদিচ—অম্বিক বিশ্বাসদেরই কেউ হওয়া সম্ভব। শিকারের পাশ নিয়ে তাঁদের স্টেশন থেকে সম্প্রতি কেউ বাদায় ঢোকে নি। দিন দুপুরে বিনা-পাশে বাদায় ঢোকা—অম্বিক ছাড়া এত সাহস কার?

বললেন, নেমে গিয়ে দেখে আয় তো খানিকটা এগিয়ে।

শূলোবন ও নোনাকাদা ভেঙে জঙ্গলে ঢোকা সহজ নয়। হয়তো সবটাই প্রমথর মনের কল্পনা। কিন্তু হুকুম হয়েছে, উপায় নেই—দু-জন মাল্লা সঙ্গে নিয়ে মুখ বেজার করে কালীপদ নেমে গেল।

ক্ষণ পরে ফিরে এসে পরমোৎসাহে বলে, ঠিক ধরেছেন কর্তা। গাছেব মাথায় গুঁটিসুঁটি হয়ে আছে।

উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে সকলে বাদায় নামলেন। মাদার আর হীরালাল ডিঙি আগলে রইল। বলে গেলেন, ফিরতে যদি দেরি হয়—ইতিমধ্যে রান্নাবান্না সেরে রাখে যেন। একটা গাদা-বন্দুকও রইল তাদের জিম্মায়। ভাঁটার টানে জল যদি অত্যধিক সরে যায়, নৌকো নাবালে সরিয়ে বাঁধতে বললেন।

জঙ্গলে হরিণের সঙ্গে বানরের বড় মিতালি। বানরে কেওড়া-গাছের ফল-পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে আর কু-কু করে নিমন্ত্রণ জানায়। ডাক শুনে হরিণের দল গাছতলায় আসে। শিকারিরাও অবিকল বানরের মতো করে ডাকে—খাবার লোভে হরিণ এলে গুলি করে গাছের উপর থেকে। গাছাল দেওয়া বলে এই রীতিকে।

বাদায় ঢুকে পড়ে প্রমথ হেন ব্যক্তিও দিশাহারা হচ্ছেন আজকে। চারিদিক থেকে কু-কু আওয়াজ। কোনটা খাঁটি আর কোনটা নকল, ঠিক কররার জন্য ক্ষণে ক্ষণে স্থির হয়ে দাঁড়ান। অনেক জল-কাদা ভেঙে ও শূলোর গুঁতো খেয়ে আন্দাজ মতো একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। কা কস্য পরিবেদনা! নির্জন নিঃশব্দ—অথচ এই এতক্ষণ একটানা ডাক শোনা যাচ্ছিল এখান থেকে। হ্যাঁ—এই জায়গাই বটে! তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন—হঠাৎ ধ্বনি ওঠে পিছনে যে দিকটা অতিক্রম করে এলেন তাঁরা। নোনা রাজ্য—পৌষমাস হলেও শীত প্রখর নয়। ঘোরাঘুরিতে ঘাম ঝরছে, কোট ভিজে জবজবে হয়ে গেছে গায়ের ঘামে এবং অসাবধানে চলাচলের দরুন জল-কাদা ছিটকে উঠে। পা রক্তাক্ত হয়েছে কাঁটার খোঁচায়, কিন্তু অম্বিক বিশ্বাসের নাগাল পাওয়ার সম্ভাবনায় প্রমথ এমন মশগুল যে আঘাত টেরই পান নি। আড়াই প্রহর অতীত হল, সঙ্গের লোকেরা অধীর হয়েছে ফিরবার জন্য। আর প্রমথ ঘুরে ঘুরে যত নাজেহাল হচ্ছেন, জেদ তাঁর তত বেড়ে যাচ্ছে।

মানুষটা তো চোখে দেখেছিস কালীপদ। গেল কোথা?

দলের মধ্যে একজন গুণীন আছে—জলধর। গুণীন বলেই খাতির করে তাকে বনকরের চাকরি দেওয়া হয়েছে। বাদায় নামবার সময় সে সঙ্গে থাকবেই। ঘাড় নেড়ে মৃদু কণ্ঠে জলধর বলে, মানুষ হলে ঠিক পাওয়া যেত। যাবে কোথা? পাখনা নেই যে উড়ে পালাবে।

. ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। অনেকের মনেই ঐ রকম সন্দেহ, প্রমথর সামনে মুখ ফুটে বলতে পারছিল না। বাদাবনে হিংস্র প্রাণী অনেক—সাপ বাঘ দাঁতাল কুমির। আরও আছে—তারাই সব চেয়ে ভয়াবহ। আদিকাল থেকে অসংখ্য লোক অপঘাতে মরেছে—লোকালয়-সীমার বাইরে আরণ্য রাজ্যে স্বচ্ছন্দ বিহার করে তারা। নানাবিধ মূর্তি ধরে উদয় হয়—বাঘের মূর্তি, সাপের মূর্তি। অব্যর্থ বাঘবন্ধন মন্ত্রেও সে বাঘের আক্রমণ ঠেকানো যায় না, সে সাপের বিষ নামাতে পারে এমন ওঝা ত্রিভুবনে নেই। মানুষের চেহারা নিয়েও কখন কখন দেখা দিয়েছে, এমনধারা শোনা যায়। আজকের ব্যাপারেই বোঝ না কেন—দেড় প্রহর থেকে সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, এখন এই প্রত্যাসন্ন সন্ধ্যাবেলাতেও এদিক-ওদিক থেকে তেমনি কু-কু ডাক এসে বিভ্রান্ত কবছে। মানুষেব কাজ বলে আর ভরসা করা যায় কি করে ?

জলধব বলে, ফেবা যাক কর্তামশায়।

ভাষাটা প্রার্থনার, কিন্তু আদেশেব আমেজ কণ্ঠস্বরে। বাদাবনের অশবীরী অধিবাসীদেব স্লুকসন্ধান এতগুলো লোকের মধ্যে একমাত্র তারই কিছু জানা। তার কথা অবহেলা করা চলে না।

যাবাব সময় কাদায় পা বসে বসে গিয়েছিল, গোলপাতায় গেরো দিয়েছিল মাঝে মাঝে। সেইসব চিহ্ন ধবে অনেক দুঃখে অনেক বার পথ হারিয়ে অবশেষে তাঁরা দোয়ানিয়ার মুখে ফিরে এলেন। ডিঙির পাত্তা নেই। জোয়ার এসেছে, জঙ্গলের অনেক দূর অবধি জল উঠে টলটল করছে। শেষ-ভাঁটায় নৌকো যদি দূরে নিয়ে বেঁধে থাকে, এখন তো আবার যথাস্থানে এসে পৌঁছবার কথা। হু-হু করে বাতাস বইছে, ভরসন্ধ্যায় জল বেশ কনকনে। তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে দারুণ উদ্বেগে প্রমথ সতৃষ্ণ চোখে দূরের দিকে চেয়ে আছেন, পকেট থেকে বাঁশি বের করে হুইশিল দিচ্ছেন,

বারংবার। বাঁশির আওয়াজ বনভূমির দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। জবাবেও ঠিক ঐ রকম আওয়াজ আসবার কথা, নৌকোর লোক যেখানে থাকুক, বাঁশিতে শিস দেবে—এই নিয়ম। কিন্তু কোন শব্দ-সাড়া নেই। হল কি? মুখ শুকনো সকলের।

মাদার ও হীরালালকে পাওয়া গেল অবশেষে। গাছে উঠে বসে ছিল, সাড়া পেয়ে নেমে এসেছে। কালীপদ রাগে চেঁচিয়ে ওঠেঃ কর্তা হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে। হারামজাদা তোরা ঘাপটি মেরে ছিলি কোথায় বল্? নৌকো কোথা?

ভয়ে তারা জবাব দিতে পারে না। তাদেরই অপরাধ। ভাঁটা সরে যাওয়ার পর অল্প জলে পাশখালিতে মাছ ধরার ভারি সুবিধা। ভাত চাপিয়ে দিয়ে দু-জনে ওরা পাশখেপলা নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল। এমন হল, মাছের ভারে জাল টেনে তোলা দায়। বাছাই মাছ গোটাকয়েক করে খালুইতে ফেলে বাদ বাকি জলে ছেড়ে দিচ্ছে। কত নেবে—কী হবে অত মাছ দিয়ে? মনের আনন্দে জাল ফেলতে ফেলতে এমনি অনেকটা দূর এগিয়েছে—তারপর খেয়াল হল, ভাত ফুটে গেছে এতক্ষণে—নামাবার প্রয়োজন। ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে পড়ল। কোথায় কি—গোটা ডিঙিটাই অদৃশ্য হয়ে গেছে। নোঙর ফেলা ছিল, শক্ত কাছি দিয়ে বাঁধা ছিল বাইনগাছের সঙ্গে—এমনি ভেসে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। খুলে নিয়ে গেছে কারা নৌকো।

বন্দুক ছিল যে!

বন্দুক সঙ্গে নিয়ে জাল ফেলবে কি করে—বাঁশি, বন্দুক সমস্ত নৌকোয় ছিল। সব গেছে। এমনটা যে হতে পারে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

প্রমথ চোখ পাকালেন একবার তাদের দিকে। স্টেশনে গিয়ে পৌঁছতে পারলে ভয়ানক কিছু হবে লোক দুটোর সম্পর্কে, সন্দেহ নেই। এখনই তো কালীপদ ক্ষণে ক্ষণে মারতে যাচ্ছেঃ

কোন আক্কেলে নৌকো ছেড়ে যাস তোরা? খা—খালুই-ভরা কাঁচা মাছ চিবিয়ে চিবিয়ে খা এখন। আর কি করবি!

জলধর ধীরকণ্ঠে বলল, ওসব যাক। ফিরবার উপায় ভাব আগে।

ক্ষিধেয় সকলের নাড়িশুদ্ধ হজম হয়ে যাবার জোগাড়। কিন্তু স্টেশনে কেমন করে ফিরবে, সেইটে বড় ভাবনা। নদী-খালে পায়ে হেঁটে যাওয়া চলে না। আর এই রাত্রিবেলা।

প্রমথ প্রশ্ন করলেন, দেওড় শুনতে পাস?

কোথায়?

সত্যি সত্যি বন্দুকের দেওড় হলে এতগুলো লোকের মধ্যে প্রমথ ছাড়া কারও কিছু কানে গেল না, এমন হতে পারে না। কিন্তু শুনতে পেয়েছেন প্রমথ। কেবল কানে শোনা নয়, চোখের উপরও যেন দেখতে পাচ্ছেন—অম্বিক বিশ্বাসই চালাকি করে সরকারি ডিঙি নিয়ে বাদাবন কাঁপিয়ে তাঁদেরই বন্দুকে দেওড় করতে করতে জয়-যাত্রায় চলেছে। আর প্রমথরা বনপ্রান্তে অপমানে দুর্ভাবনায় পৌষের শীতে হি-হি করে কাঁপছেন, নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া কিছু করবার নেই।

প্রমথ চেঁচিয়ে উঠলেন, ঐ যে—ঐ শোন্—

অনতিদূরে হা-হা-হা হাসির শব্দ। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি। এই তো—একেবারে কাছে। ক্ষিপ্ত প্রমথ জলকাদা ভেঙে ছুটলেন। আরও অনেকে ছুটল।

কালীপদ দেখিয়ে দিল, মানুষ নয়—ভীমরাজ পাখী। লেজ নাড়ছে ডালে বসে।

নির্জন অরণ্যভূমে এই এক আশ্চর্য পাখী মাঝে মাঝে বয়স্ক মানুষের কণ্ঠস্বরে গম্ভীর উচ্চহাসি হাসে; অবোধ্য ভাষায় কাকে যেন কি আদেশ দেয়। দেখা গেল, জলধর বিড়বিড় করে কি বলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। সে এদের শুধুমাত্র পাখি বলে স্বীকার করে না।

শুকনো কাঠ-পাতা জ্বেলে দোয়ানিয়ার ধারে তাঁরা জেগে বসে কাটালেন। স্টেশনে পৌঁছতে পরের দিন বিকাল। নিতান্ত প্রমথ হালদার বলেই পৌঁছতে পারলেন শেষ পর্যন্ত।

এসে দেখলেন, সেই ডিঙি ঘাটে বাঁধা। রাত্রির মধ্যেই রেখে গেছে। স্টেশনের পাহারায় যারা ছিল, কেউ টের পায় নি। প্রমথদের যথেষ্ট নাজেহাল করা হয়েছে, ডিঙির আর তাদের প্রয়োজন কি! বন্দুক দেয় নি—নিয়ে নিয়েছে সেটা।

প্রমথ ক্ষেপে উঠলেন, মরে মরে পাহারা দিচ্ছিলি বেটারা? ডিঙি না রেখে তোদের বোঝাই করে নিয়ে পিঠটান দিল না কেন? আপদ চুকত তা হলে।

অস্নাত অভুক্ত প্রমথ পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, অম্বিক বিশ্বাসকে জব্দ তিনি করবেনই। চিরজীবনের মতো শিক্ষা দিয়ে দেবেন আর যাতে বাদাবনে শয়তানি করতে না আসে!

নিজেদের ভুলত্রুটি যথাসম্ভব রেখেঢেকে সদরে বন্দুক-চুরির রিপোর্ট পাঠালেন। কড়া পুলিশ-পেট্রোল শুরু হল। খুব উত্তেজনা চলল দিনকতক। খোঁজে খোঁজে বহু জায়গায় হানা দেওয়া হল—অম্বিক বিশ্বাসের আস্তানা মেলে না। আস্তানা নেই। আয়েশে মাথা গুঁজে থাকবার আস্তানা এবং সুখশান্তির সংসারধর্ম থাকলে এমন উচ্ছৃঙ্খল কেউ হতে পারে! এই দেখ না, ঝড়ের মতো আচমকা জঙ্গলে এসে পড়বে। কোন পথে কি উদ্দেশ্যে আসবে, বুঝবার উপায় নেই আগে থাকতে। কখনো আসে হরিণ মারতে, কখনো কাঠ কিংবা গোলপাতা কাটতে, কখনো মোমমধু ভাঙতে, আবার কখনো বা নিতান্তই অকারণে বোধকরি ক্ষেপিয়ে মজা দেখবার জন্য বনকরের কর্তাদের। আইনকানুনের ধার ধারে না, সরকারের ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা দিয়ে পূর্বাহ্ণে অনুমতি নেওয়া বোধকরি ওরা কাপুরুষতা বলে মনে করে। ঝুনঝুনি-স্টেশনের কাছাকাছি এসে বন্দুকের দেওড় করে। প্রমথ ভাবেন, তাঁদেরই সেই গাদা বন্দুকটা। মানসেলায় দেশি

কামারের তৈরি বিনা-পাশের বন্দুক অজস্র পাওয়া যায়, তেমনি কোন বন্দুক হওয়া অসম্ভব নয়—কিন্তু এদের প্রতিটি ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে প্রমথর মনে ভেসে ওঠে সেদিনকার অপমানকর স্মৃতি।

বছরখানেক কাটল। উত্তেজনা অনেক শান্ত হয়েছে। জল-পুলিশের টহল প্রায় বন্ধ। অম্বিকদের বাদা-অভিযানের খবরও ইদানীং শোনা যায় না। চৌধুরি সাহেবের ধারণা, তাঁদের তোড়-জোড় দেখে ভয়ে সে আত্মগোপন করেছে। কিন্তু প্রমথর রাগ যায় নি। যত শান্তশিষ্ট হয়েই থাকে, জব্দ তাকে করবেনই—অপমানের শোধ তুলবেন। বাদা অঞ্চল ছেড়ে যদি পালিয়ে থাকে, সেটা অবশ্য আলাদা কথা।

গুয়াতলির সপ্তাহান্তিক হাট। দুই নদীর মোহানার উপর হাটখোলা। সকাল থেকে খরিদ্দার জমে, বেলা যত বাড়ে হাট তত জমজমাট হয়, নৌকোয় নৌকোয় দুটো নদীর জল প্রায় অদৃশ্য হয়ে ওঠে। তারপর হাটবেসাতি সেরে নোঙর তুলে হাটুরেরা একে দুয়ে নৌকো ছাড়ে, রাত্রি প্রহরখানেক হতে না হতে জনকোলাহল একেবারে স্তব্ধ। গুয়াতলি প্রেতপুরীর মতো থমথম করে। এমনি অবস্থায় আবার ছ'টা দিন—ছ'টা দিন ও রাত্রি—তিন-চার শ' টিনের চালা নিঃসীম আকাশের নিচে নদীর মোহানায় জোয়ার-ভাঁটার উচ্ছলতা নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে শুধু। একটি লোক নামে না ওখানে, একটি মানুষের কণ্ঠ শোনা যায় না।

বাদাবনের সঙ্গে বহির্দেশের যোগসূত্র এই হাট। বাদাবনের লোক পুরো সপ্তাহের চাল-ডাল তেল-নুন আনাজপত্র কিনে নিয়ে যায়। আর নিয়ে যায় ডাকের চিঠি ও খবরের কাগজ। জীয়ন্ত পৃথিবীর শ্বাস-প্রশ্বাস ও হাসিকান্নার ধ্বনি খানিকটা সঙ্গে করে নিয়ে আবার জঙ্গলে ঢোকে। হাটবারের পর যেন উৎসব পড়ে যায় স্টেশনের হেঁসেল-ঘরে, বাওয়ালিদের নৌকোয় নৌকোয়; শাকপাতা

ও কাঁচা আনাজ রান্না-খাওয়া হয়। দুটো তিনটে দিন পরে আবার যথাপূর্ব অবস্থা—তরিতরকারির মধ্যে মিঠাকুমড়া ও গোল-আলু।

প্রমথ এবার নিজে এসেছেন গুয়াতলি। কষ্টসাধ্য ভ্রমণ—পুরো দেড়টি দিন লাগে যাতায়াতে, বেগোনে হলে আরও বেশি। খাওয়া-দাওয়া হয় না পথে, আধখানা হয়ে যেতে হয়। কিন্তু চৌধুরি সাহেবের আদেশ—গুয়াতলির কুতঘাটায় লঞ্চ থামিয়ে তিনি কিছু জরুরি কাজকর্ম সেরে যেতে চান প্রমথর সঙ্গে। খাস জঙ্গল কুড়ুলতলায় এবার পাশ দেওয়া হবে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা। সময়ের নির্দেশ নেই—অতএব সেই ভোরবেলা থেকে ঘাটের অফিসে প্রমথ অপেক্ষমান। হাট ভাঙতে চলল—প্রতি মুহূর্তেই আশা করছেন, বাঁক পার হয়ে চৌধুরির লঞ্চ দেখা দেবে এইবার। চাপরাশিটা বারান্দায় বসে ঢুলছে। বিষম বিরক্তি লাগে প্রমথর। কথা দিয়ে কথার ঠিক রাখেন না—কী রকম সাহেবলোক এঁরা! খাঁটি সাদা সাহেব আর দেশি সাহেবে তফাৎ এইখানে। কিন্তু আর থাকা কোনক্রমে তো চলে না! তা হলে কাল দুপুর অবধি—যতক্ষণ আবার ভাঁটা না লাগে, একটানা বসে থাকতে হবে এমনি। এলেন না চৌধুরি সাহেব—আসবার হলে অনেকক্ষণ এসে যেতেন।

এবারে প্রমথ বোটে করে এসেছেন। মাঝি সেই চরণদাস। সে-ও অস্থির হচ্ছে। হাটুরে নৌকো এবং যত পূবদেশি ব্যাপারি নৌকো ঘাট খালি করে চলে গেল। হাটের চালায় এই এখানে সেই ওখানে দু-একটা টেমি জ্বলছে। শেষ রাতের জোয়ার ধরবে ওরা, বিড়বিড় করে টাকাপয়সার হিসাব করছে, কিম্বা তিন টুকরো কাঠ পুঁতে তার উপর নতুন হাঁড়িতে রান্না চাপিয়েছে। বিষম বিরক্ত হচ্ছে চরণ—ছোটখাট বাড়ির মতো বিপুলায়তন এই বোট—গোন মারা গেলে মরা-হাতির মতো চরে চেপে পড়বে, কাছি বেঁধে সকলে মিলে টানাটানি করেও এক হাত নড়ানো যাবে না!

কত্তা এলেন?····কে? কে গা তুমি?

কুতঘাটার জোরালো পাঞ্চের আলোয় দেখা যায়, কমবয়সি একটি মেয়ে, হাতে নতুন গামছায় বাঁধা বোঁচকা, ধীরেসুস্থে বোটে এসে উঠল।

বিস্মিত চরণদাস প্রশ্ন করে, কে তুমি? যাবে কোথায়?

মেয়েটা জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করে না। কাড়ালে উবু হয়ে বসে রগড়ে রগড়ে পায়ের কাদা ধোয়। পরিপুষ্ট গড়ন। নোনা-রাজ্যে গৌরবর্ণ প্রত্যাশা করা যায় না, কিন্তু কালোর মধ্যে দিব্যি চিকণ আভা।

চরণদাস পুনরপি বলে, ভুল হয়েছে গো ভালমানুষের মেয়ে। গয়নার নৌকো এ নয়।

চোখ মেলে তাকাল মেয়েটা। বড় বড় চোখ। দৃষ্টি দিয়ে হেলা ভরে তাকায় যেন বিশ্বভুবনের সব-কিছুর প্রতি। বলল, জানি, গয়নার নৌকো ছেড়ে গেছে। অনেক কেনাকাটা করতে হল। ছুটোছুটি করে ঘাটে আসব—তা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। দেরি হয়ে গেল।

যাবে কোথা তুমি?

সে প্রশ্ন কানে না নিয়ে পুঁটলি খুলে ফেলে মেয়েটা আবার ভাল করে বাঁধতে বসে।

জলতরঙ্গ চুড়ি কিনলাম। কেমন হল দেখ দিকি—মানাবে? এই সেমিজ কিনেছি। চুড়িগুলো সেমিজে জড়িয়ে রাখা যাক। তা হলে ভাঙবে না, কি বল? চুড়ি দু-জোড়া চার আনা নিল—ঠকিয়েছে?

চরণ বলে, আমরা চুড়ি কিনি নে। দর জানব ক্যামনে?

চুড়ি-সেমিজ শুধু নয়, তরল আলতা, চুলের কাঁটা, ছাপা রুমাল—রাশিকৃত শৌখিন জিনিস। গর্বিত কণ্ঠে মেয়েটা বলে, অপরে এমন পছন্দ করে কিনতে পারে! নিজে তাই চলে এলাম। সবাই জানে, মাসির বাড়ি এসেছি। হি-হি-হি—

চরণ বিরক্ত হয়ে বলে, সরকারি না আমাদের এটা। জঙ্গলে যাচ্ছি।

যাও না যে চুলোয় খুশি! বকডোবার চরে আমায় নামিয়ে দিয়ে যেও।

সুখ কত! তিন বাঁক ঘুরে যাচ্ছি তোমায় বকডোবা নামাতে! এমনি বলে কোন্‌খানে চাপান দিয়ে থাকতে হয়, ঠিক নেই। নেমে যাও বাছা, অন্য নৌকোর চেষ্টা দেখ।

মেয়েটা ঝঙ্কার দিয়ে উঠেঃ অন্য নৌকো থাকলে তোমাদের খোশামুদি করতে আসি! বয়ে গেছে, আমার পা কাঁদছে!

খোশামুদির বহর দেখে চরণদাসের ইচ্ছে করে লগির বাড়িতে ঘন চুল-ভরা মাথাটা তার দু-ফাঁক করে দেয়। চাউনির রকম দেখে মেয়েটাও হয়তো বুঝেছে। আর কথা কাটাকাটি করল না, মাদুর গুটানো ছিল—সেইটা পেতে পুঁটলি মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে আবার বুড়ো দাঁড়িকে হুকুম করছে নবাবনন্দিনীঃ তোমার ঐ আগুনের মালসা নিয়ে এস তো মুরুব্বির পো।

দাঁড়ি কানে নেয় না, আপন মনে তামাক খাচ্ছে।

এবারে একেবারে মধু-ঢালা কণ্ঠ। বলে, পা মচকে গিয়ে বড্ড টাটাচ্ছে। মালসাটা এদিকে এনে একটুখানি যদি সেঁক দিয়ে দাও।

বজ্জাতি বোঝ। বুড়োর দিকে চেয়ে এখনও বলছে বটে, কিন্তু এবারের লক্ষ্য এক ছোকরা—বনমালী। কলকের জন্য বুড়োর সামনে অনেকক্ষণ থেকে সতৃষ্ণ নয়নে বসে আছে। এমন তামাকের পিপাসা —কিন্তু মুহূর্তে তা ভুলে গেল। মালসা সহ মেয়েটির কাছে গিয়ে আগুনে দু-হাতের চেটো গরম করে পায়ের উপর ব্যথার জায়গায় চেপে চেপে ধরছে। কোন দিকে তাকায় না বনমালী—আর সকলে কি ভাবছে, ভ্রূক্ষেপ করে না।

গোড়ার দিকে আঃ-আঃ—করে বেদনা বা আরাম জানাচ্ছিল

মেয়েটা। পরে শব্দসাড়া নেই। এতক্ষণে প্রমথ এলেন—দূর থেকে দেখেই বনমালী সরে বসেছে।

প্রমথর মন-মেজাজ ভাল নয়। পথ আটকে পাটাতনে আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে আছে—প্রমথ হাঁক দিলেন, কে রে তুই?

বিস্তর চেঁচামেচিতে মেয়েটা একটুখানি পাশ ফিরে শুল।

বোটের লোকজনের উদ্দেশে প্রমথ বললেন, তোরা কি করছিলি রে? অর্ধেকখানি জুড়ে চেপে পড়েছে, এ হিমালয়পর্বত নামিয়ে দেওয়া সোজা হবে এখন?

বুড়ো দাঁড়ি বলে, কথা কানে নেয় না। কী করা যাবে! এসে সটান শুয়ে পড়ল। পা সেঁকিয়ে নিল বোনাকে দিয়ে।

চরণদাস বলল, ছুঁড়ি উঠবে না, ছুতো ধরে পড়ে আছে। আর দেরি করলে কিন্তু সুতারখালির মুখে বেগোন পড়ে যাবে, নৌকো বেঁধে চৌপহর বসে থাকতে হবে।

প্রমথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, ঠিক, ঠিক! ছেড়ে দাও। কিন্তু মুশকিল এই উড়োআপদ নিয়ে।

বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে, কতকাল ঘুমোয় নি যেন। প্রবল স্রোতে বোট ছুটেছে। এতগুলো পুরুষলোকের মধ্যে একলা সোমত্ত মেয়ে—আর এদের গন্তব্যপথ নির্মানব বনভূমি—তা বলে এতটুকু ভয় বা সঙ্কোচ নেই।

ঘণ্টা দুই পরে চোখ মুছতে মুছতে মেয়েটা উঠে বসে।

কোথায় এলাম গো?

কেউ জবাব দিল না। কূলের দিকে তাকিয়ে সে স্থান-নিরূপণের চেষ্টা করে।

উই তো—সুতারখালি ঐ যে!

প্রমথ খালি গায়ে আয়েস করে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছেন।

তাঁর দিকে চেয়ে অনুনয় করে বলল, বাবুমশায়, বকডোবায় নামিয়ে দিতে বল ওদের—

প্রমথ সজোরে ঘাড় নাড়লেন : পাগল নাকি! অতখানি ঘুর —তা ছাড়া জায়গাটা অতি খারাপ।

ভাল জায়গা এ তল্লাটে আছে কোথাও? এই যে যাচ্ছি—এ বুঝি বড্ড ভাল! ও-বছর ভাসন্ত নৌকোয় কাটা-মানুষ পাওয়া গেল, সে তো এইখানেই।

প্রমথর বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে। বকডোবার মতো অত ভয়ানক নয় যদিচ, এই সুতারখালির মুখেও নৌকো মারার ইতিহাস আছে। দপ করে একবার জোবালো আলো জ্বলে উঠল এই সময়টা পাড়ের দিকে কোথায়। অন্ধকার-মগ্ন ক'টা জেলে-ডিঙি সাঁ করে এধার-ওধার পাশ কাটিয়ে গেল। বুড়ো দাঁড়ি কলকে ধরাতে যাচ্ছিল, প্রমথ নিম্নকণ্ঠে নিষেধ করলেন : উঁহু, আলো জ্বালিস নে। কাজ কি! আগুন অনেক দূর থেকে দেখা যায়। মালসা ঢাকা দিয়ে দে বরং। সব ক'টা দাঁড় পড়ুক। হাল টেনে যাও চরণদাস, ঝিমোও কেন?

মেয়েটা বলে, নিয়ে চললে কোথা গো?

চরণদাস মেজাজের সঙ্গে জবাব দেয়, ঝুনঝুনি বনকর-আফিস—

একটু তবে পাড়ে ধর। আমি নেমে যাই।

চরণদাস আশ্চর্য হয়ে বলে, এখানে? বকডোবা এখান থেকে কত পথ তা জান?

যেতেই হবে। না গিয়ে ছাড়ান নেই।

বলে সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

চরণদাস বলে, পথঘাটের কোনরকম নিশানা নেই কিন্তু। চার-চারটে খাল পার হতে হবে।

সমস্ত জানি মুরুব্বির পো। আমরা হলাম গে বাদাবনের জন্তু—

চরণদাস আবার সতর্ক করে : এ বাদা বড্ড গরম (অর্থাৎ বাঘের ভয় আছে), জলে কুমির-কামট।

কপালে থাকলে নিয়ে যাবে। এই যে লা'র উপরে আছি, তোমরাই বা কী আরামে রেখেছ !

বনমালী বলে, জন্তু-জানোয়ারে খাবে না এখানে।

খাবে না কি বল ? খাচ্ছেই তো !

আঙুল দিয়ে দেখাল সে প্রমথর দিকে। বলে, তোমাদের ঠাকুরমশায় লোক কিন্তু সুবিধের নয়। চোখ দিয়ে খুবলাচ্ছে কী রকম, ঐ দেখ।

বেকুব হলেন প্রমথ। আড়চোখে ক্ষণে ক্ষণে তাকাচ্ছিলেন তিনি নিটোলস্বাস্থ্য স্বল্পবাস মেয়েটার দিকে। কে না তাকায়! চোখ সরিয়ে নিয়ে তিনি তাড়া দিয়ে ওঠেন ঃ চোপরও হারামজাদি !

দাঁড়ি-মাঝিরা উপভোগ করছিল। প্রমথর কিঞ্চিৎ বাহিরফটকা নজর আছে, সবাই জানে। মেয়েটা উচিতমতো জবাব দিয়েছে।

চরণদাস জিজ্ঞাসা করে, কি নাম তোমার গা ?

ভমর—ভমরমণি—

ভমর নও মা-লক্ষ্মী, ভীমরুল—

ভমর সহসা পুঁটলি তুলে উঠে দাঁড়াল।

পেন্নাম হই ঠাকুরমশায়। নৌকো পারে ধরতে বললাম, তা তো শুনলে না। চললাম।

ভয়াল নদীস্রোতের মধ্যে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। দুর্নিরীক্ষ্য তটসীমা। নোনা জলতরঙ্গ আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে বোটের গায়ে, অত বড় বোট অসহায়ের মতো আন্দোলিত হচ্ছে—ভমর ঝাঁপ দিল এরই মধ্যে। কুমীর-কামট ওৎ পেতে রয়েছে, লোকে পা ধুতে সাহস করে না এই অঞ্চলের নদী-খালে। এই নদী সাঁতরে কূলে উঠে বকডোবা অবধি নাকি পায়ে হেঁটে চলে যাবে! আত্মহত্যাই বলা উচিত একে।

ঝুনঝুনি ফিরে চৌধুরি সাহেবের চিঠি পাওয়া গেল। চিঠি নিয়ে

লোক পৌঁছবার আগেই এঁরা গুয়াতলি রওনা হয়ে গিয়েছিলেন, তাই মিছে হয়রানি হল। চৌধুরি লিখেছেন—সোজা সুপতি চলে যাচ্ছেন তিনি, গুয়াতলি হয়ে যাবার অবসর হল না, প্রমথ ঐ সুপতি গিয়ে দেখা করেন যেন তাঁর সঙ্গে। অতি সত্বর—কারণ দু-একদিন মাত্র থেকে ডেসপ্যাচ-স্টিমারে কলকাতা চলে যাবেন।

জোয়ার-ভাঁটার হিসাব করে দেখা গেল, এই মুহূর্তে পুনশ্চ যাত্রা করলে কায়ক্লেশে চৌধুরি সাহেবের সাক্ষাৎ মিলতে পারে। দুটোভাতে-ভাত খেয়ে নিলেন সকলে। প্রমথ শুয়ে বসে থাকবেন, তাঁর কথা হচ্ছে না—পেটে ভর না থাকলে মাঝি-মাল্লারা পেরে উঠবে কেন?

ঝড় উঠল সন্ধ্যার কাছাকাছি। বলেশ্বর-বিষখালির সঙ্গমস্থল—বড় ভয়ানক জায়গা। জল যখন শান্ত থাকে, তখনও পার হতে বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করে পাকাপোক্ত মাঝির। আর এখন ঘনকালো মেঘের প্রাচুর্যে একটুখানি চিকণ আভা আকাশের কোনখানে নেই। জলতরঙ্গ সংখ্যাহীন ক্রুদ্ধ সরীসৃপের মতো দূরদিগন্ত থেকে ছুটে আসছে—লক্ষ্য যেন এদেরই এই নৌকোটা। জনালয়ের চিহ্ন নেই কোনদিকে।

চরণদাস শক্ত হাতে হাল ধরে আছে স্থির পাষাণ-মূর্তির মতো। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অলক্ষ্য কোন তটভূমির দিকে। খরস্রোতে আর পিঠেন বাতাসে হু-হু করে বোট ছুটেছে। চরণদাস ছুটতে দিয়েছে, এ অবস্থায় বিরুদ্ধতা করতে গেলেই বোট উল্টে যাবে। যায় যেখানে, যাক। মচ-মচ করে হালে বিষম আওয়াজ হচ্ছে এক-একবার। জলতাড়নায় ভেঙে বুঝি দু-খণ্ড হয়ে যায়। মজা বাধে তা হলে। দিক্‌চিহ্নহীন জলরাশির উপর দু-একবার পাক খেয়ে এত বড় বোট মোচার খোলার মতো মগ্ন হয়ে যাবে। বিপদের মুখে আশ্চর্য দৃঢ়তা চরণদাসের। হাত একটু কাঁপে না, মুখের উপর ভয়ের রেখামাত্র নেই।

প্রমথ বলে উঠলেন, ডাঙা কোন দিকে?

দেখা যায় নাকি কোন-কিছু ?

তবে ? তবে কি হবে ?

চরণদাস রূঢ়কণ্ঠে বলে, নড়াচড়া করবেন না। শুয়ে শুয়ে থাকেন ছইয়ের মধ্যে ঢুকে।

হি-হি করে হেসে বলে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়েন। ডুবে গেলে শীত করবে না।

পুরানো লোক চরনদাস ; প্রমথ যখন কাজে ঢুকলেন, তার আগে থাকতে আছে। তাই সে ততটা গ্রাহ্য করে না প্রমথকে। আর এখন এই ভয়াল নদীর বুকে সে সর্বেসর্বা—বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের সঙ্গে লড়ায়ের সেনাপতি। প্রমথর ডাঙারাজ্য এটা নয়।

রাত দুপুর অবধি চলল এই রকম। অবশেষে কূল মিলল। ঘ্যস্-স্—করে মাটিতে ঠেকল বোটের মাথা, গতি থেমে গেল। শুয়ে ছিলেন প্রমথ, শুয়ে শুয়ে দুশ্চিন্তার ঝড় বইছিল মনের ভিতর। হঠাৎ চরণ দাসের খরকণ্ঠ ঃ উঠে পডেন, উঠে পড়েন—আর ভয় নেই।

কোথায় ?

মালুম হচ্ছে না। আলো দেখা গেল—সেই নিরিখে এসেছি। এসে পৌছতে পেরেছি, বাপেব ভাগ্যি।

ঝড়বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে এখন। ডাঙায় নামলেন প্রমথ, নেমে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।

নেমে দেখ্ না তোরা, কোন্খানে এলাম হদিস পাওয়া যায় কি না ?

চরণদাস হাত কয়েক দূরে খাড়ির মুখে বোট নিয়ে যেতে ব্যস্ত।

পছন্দসই জায়গাটা—চাপান দিয়ে থাকা যাবে ভাঁটার প্রতীক্ষায়। ঝড়ে জলে অত্যধিক দেরি হয়ে গেছে, কত দূরে এসে পড়েছে আন্দাজ হচ্ছে না। সে যাই হোক, উজান ঠেলে চলা কোনক্রমে আর সম্ভব নয়—বোট এগোয় না, পরিশ্রমই সার।

মিটমিটে এক আলো দেখতে পেয়েছিল, সেই আলো ক্রমশ কাছে চলে এল। তিনজন লোক—কলরব করে উঠল তারা।

ঐ যে, ঐ এসেছেন!

বললাম যে, ঠিক এসে যাবেন। বিষ্টিবাদলায় দেরি হয়ে গেছে। কিছু বোলো না এখন—এসে গেছেন, সেই ঢের।

প্রমথর কাছে এসে তারা থমকে দাঁড়াল। চৌখুপির মধ্যে কেরোসিনের টেমি একজনের হাতে। লণ্ঠন তুলে প্রমথর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে তাকায়।

কারা তোমরা?

দুষমন-আকৃতি লোক তিনটার গলার আওয়াজে বুকের ভিতরটা অবধি গুরগুর করে ওঠে। নদীকূলবর্তী এই লোকগুলার রীতি-প্রকৃতি প্রমথর অজানা নয়। গলা শুকিয়ে কাঠ, সহসা জবাব দিতে পারেন না।

চরণদাস এসে দাঁড়াতে কিছু সাহস পেলেন। চরণদাস বলে, নৌকো বানচাল হয়ে এসে পড়েছি বাবাসকল। ভাঁটি ধরলে ছেড়ে দেব।

হাতে-লণ্ঠন লোকটা প্রমথর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, কি লোক আপনি মশায়?

ব্রাহ্মণ—এই পৈতে দেখ বাবা—খাঁটি নৈকষ্য কুলীন।

তাড়াতাড়ি জামার বোতাম খুলে পৈতে টেনে দেখালেন প্রমাণ স্বরূপ। লজ্জায় সঙ্কোচে আর যা ব্যক্ত করতে পারছেন না সেটা হল—অব্যাহতি দাও বাপধনেরা, ব্রহ্মহত্যা ও ব্রহ্মস্ব হরণ করে মহপাতকের ভাগী হোয়ো না।

পৈতে দেখিয়ে মন্ত্রের কাজ হল। তিনজন গড় হয়ে প্রণাম করল প্রমথকে, পায়ের ধূলো গালে মাথায় দিল। গো-ব্রাহ্মণে এদের ভক্তি সুবিদিত।

আসতে আজ্ঞা হয়—চলে আসেন।

লণ্ঠনধারী লোকটা সসম্ভ্রমে আলো দেখিয়ে বাঁধের উপর উঠে দাঁড়াল।

গাঙের উপরে পড়ে কষ্ট পাবেন কেন? পাড়ার মধ্যে আসুন।

প্রমথ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন তাদের দিকে।

না বাবা, বেশ তো আছি, দিব্যি আছি। আর কতক্ষণ! জোয়ারের টান একটু থমাথমা হলেই নৌকো ছেড়ে দিচ্ছি।

জায়গাটা ভাল নয়, নানা রকম ভয়ভীত আছে।

প্রমথ বললেন, তোমরা বাপধনেরা রয়েছ আশেপাশে, কে কি করতে পারে?

সকলের পিছনের লোকটা এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। সে হুমকি দিয়ে উঠল: তারপর গিয়ে তো দশ জায়গায় বলে বেড়াবে, বকডোবার মানুষ বিষম ছ্যাঁচড়া—সারা রাত্তির ঘাটে পড়ে রইলাম, কেউ একবার ঝিঙেনাড়া করল না।

হাতে তার পাঁচহাতি পাকা বাঁশের লাঠি। মাটিতে লাঠি ঠুকে বলে, ভ্যাজর-ভ্যাজর করতে পারি নে, কাজ আছে। চলে আসেন।

লাঠির মাথার আংটা ঝুন-ঝুন করে উঠল আঘাতে। প্রমথ ও চরণদাস মুখোমুখি তাকান। কাল আসেন নি, ঝড়ে আজকে এনে ফেলল ঠিক সেই বকডোবায়!

অতএব অতিথি-বৎসল বকডোবার আমন্ত্রণে প্রমথ পাড়ার ভিতরে চললেন। লণ্ঠনওয়ালা লোকটা আগে আগে আলো দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সকলের পিছনে সেই লাঠিধারী। একা নন প্রমথ, চরণদাসকেও সঙ্গে নিয়েছেন।

তারা ফুটেছে দু-চারটে, আঁধারলিপ্ত চতুর্দিক অল্পসল্প এইবার নজরে আসে। বড়-নদী এ-ধারে, পিছনে বিল। বিলে ধানের সমারোহ। উন্মত্ত তরঙ্গ-তাড়নায় পাঁড়ের মাটি ঝুপ-ঝুপ করে নদীগর্ভে পড়ছে অবিরত। এই বকডোবা। জগৎ-সংসার থেকে

আলাদা—তারার আবছা আলোয় রহস্যময় নিরালা গ্রাম। হাঁটা-পথে যাতায়াতের উপায় নেই। এ-বাড়ি ও-বাড়ি যেতে হলেও ডিঙি—নিতান্ত পক্ষে মাটির গামলায় ভেসে যেতে হবে।

মনটা খারাপ ছিল প্রমথর—বাঁধের উপর জল জমে ছিল, নজরে পড়ে নি। জুতোসুদ্ধ তার মধ্যে পড়লেন। জল-কাদা ছিটকে মাখামাখি হয়ে গেল জামা-কাপড়ে। লণ্ঠনধারী খানিকটা এগিয়ে ছিল, আহা-হা—করে কাছে এল। এত দুর্গতিও ছিল অদৃষ্টে! প্রমথর চোখে জল আসবার মতো।

নৌকোয় ফিরে যাই বাপধন—

এসে গেছি ঠাকুরমশায়। ঐ যে। কাপড় বদলে আরাম করবেন এবারে, পান-তামাক খাবেন।

নদীতট থেকে মনে হচ্ছিল, খান কয়েক খোড়োঘর নদী ও বিলের মধ্যে অনন্ত আকাশের নিচে অসহায় ভারে দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ার মধ্যে পা দিয়ে অবাক হলেন। খোড়োঘর বটে—কিন্তু বাদার সুন্দরী-কাঠের খুঁটি, গরাণের ছিটে দিয়ে চাল তৈরি। অধিকাংশই মাটির দেয়াল-দেওয়া। দৃঢ় পরিপাটি ঘর। আর ঘরের সংখ্যাও একটা-দুটো নয়—ফাঁকা জমি বিশেষ নেই বকডোবা টিলার উপর, সর্বত্র ঘর তুলেছে। মানুষই বা কত! যে তিনজন গাঙের ধারে গিয়েছিল, সকলেই প্রায় ঐ ধাঁচের—শক্তসমর্থ জোয়ান মেয়ে-পুরুষ। বয়সে বুড়ো হলেও এরা জোয়ান থাকে। বয়সে যারা শিশু, তারাও সামান্য এক বৈঠা ভরসা করে বিশাল গাঙ পাড়ি দিয়ে মাদুর তৈরির জন্য ওপারে মালি কাটতে যায়। অতবড় বিলের সম্পূর্ণ কারকিত এই টিলার লোকগুলোই শুধু করে।

বুক কাঁপে প্রমথর—এত সমাদর কেন তাঁকে! কী মতলবে নিয়ে এল পাড়ায় ভিতরে! প্রতি কাজেই এদের বাদায় ঢুকবার গরজ পড়ে, আর বাদার ঘাঁটি আগলে বসে আছেন প্রমথরা। সে হিসাবে অহি-নকুল সম্পর্ক পরস্পরের মধ্যে। লোকগুলো কেমন

ভাবে তাকাচ্ছে—এখানে এই পাড়ার ভিতরে যদি টুকরো-টুকরো করে কেটে ফেলে, ত্রিভুবনে কেউ কোনদিন খোঁজ পাবে না।

না, খুবই আদর-যত্ন করল। দই-মিষ্টি, কাঁঠাল, আনারস আর শসা—ভূরিভোজন হয়েছে। কোরা ধুতি-চাদর দিয়েছে বের করে, কাদা-মাখা কাপড়জামা ওদেরই একটি মেয়ে কেচে টাঙিয়ে দিয়ে গেছে দুই খুঁটির সঙ্গে। প্রমথর বিষম ক্ষিধে পেয়েছিল —দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। আতিথ্যে আপ্যায়িত হয়ে এখন শুয়ে পড়েছেন চাদর মুড়ি দিয়ে। চরণদাসও একটু দূরে আলাদা মাদুরে শুয়েছে।

ঘুমের আবিল এসেছিল। এসে ডাকছে, উঠুন—উঠতে আজ্ঞা হয় ঠাকুরমশায়। কত ভাগ্যে এসে পড়েছেন আজকের দিনে। উঠে আসেন—মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করবেন।

চোখ রগড়ে প্রমথ চেয়ে দেখলেন, লণ্ঠন নিয়ে যে-লোকটা পথ দেখিয়ে এসেছিল—সে-ই। পরক্ষণে একটা দল এসে পড়ল। হুড়মুড় করে কতক ঘরের মধ্যে ঢুকল, কতক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। রুক্ষ কণ্ঠে তারা তাগিদ দেয়, কই গো—হল কি?

চরণদাস বলে, যাচ্ছি আমরা—

কিসে যাচ্ছ? গজে না ডুলিতে? রাত কাবার হয়ে যায়—এখনো যাচ্ছি!

প্রমথ উঠলেন তাড়াতাড়ি। বললেন, পায়ে শামুকের কুচি ফুটে গেছে। টাটাচ্ছে।

বলেন তো আড়কোলা করে নিয়ে যাওয়া যায়।

শুধুমাত্র মুখের কথা নয়, বক্তা সত্যি সত্যি কোমর বাঁধছে। প্রমথ হাঁ-হাঁ করে ওঠেন: হেঁটেই যাচ্ছি বাপধন। দেখেশুনে একটু আস্তে আস্তে যেতে হবে।

আরও তারা ফুটেছে। অল্প অল্প মেঘ আছে, কিন্তু আর বৃষ্টি

হবে না বোধহয়। উঠান ঝাঁট দিয়ে ফেলে তার উপর প্রচুর তুষ ছড়িয়ে জায়গাটা শুকনা করেছে। সপ পেতে সেখানে বিয়ের আসর। উঠান, ঘরের দাওয়া আনাচ-কানাচ ভরে গেছে নিমন্ত্রিতবর্গে। বর এসে পিঁড়িতে বসেছে।

একজনে তাড়াতাড়ি বরাসনের সামনে জলচৌকি এনে দিল প্রমথর বসবার জন্য : বসেন, বসেন—কত ভাগ্যি আমাদের!

বরকর্তা বরযাত্রীদলের মধ্য থেকে এগিয়ে এসে প্রমথর পায়ের কাছে হাঁটু গড়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বসল।

বিস্মিত প্রমথ প্রশ্ন করেন, কি?

পদরজ দেন একটু। বর হল আমার ভাই। ঠাকুর স্বর্গে গেছেন। মনে বড় ভাবনা হয়েছিল, ব্রাহ্মণ অভাবে বিয়ে হবে কেমনে? তা মা-কালী আপনাকে নিয়ে এলেন। খুব রক্ষে হয়েছে।

সেই লণ্ঠনবাহী লোকটা হল কনের বাপ—এখন বোঝা গেছে। সে বলে, জাত-যাওয়া কাণ্ড ঠাকুরমশায়। পুরুত আনতে রওনা হয়ে গেছে পরশুদিন—সে লোক এখনো ফিরল না। ঝড়ে বিপদ আপদ ঘটল কিম্বা আর কী হল—কে জানে!

বরকর্তা বলে, নেমে এইবার আসনে বসেন ঠাকুরমশায়।

প্রমথ ঘাড় নাড়লেন : আমি পারব না তো বাবা। বাদাবনে পড়ে থাকি। পুরুতের কাজ করি নি কখনো। মন্তরতন্তর কিছু জানা নেই।

বরের ভাই সহসা হুঙ্কার দিয়ে উঠল : যে পুরুতঠাকুর আনবার জন্য গিয়েছে, তিনিই বা কী এমন দিগ্‌গজ ভটচাজ্জি! দুটো ফুল ফেলে দিলেই হল, মন্তর বেশি লাগে না আমাদের বিয়েয়।

কন্যাকর্তারও মেজাজ চড়েছে : পৈতেওয়ালা জলজ্যান্ত ব্রাহ্মণ হাজির থাকতে বিয়ে হবে না, এ কি একটা কথার কথা হল!

বর ও কন্যাপক্ষীয় নানাজনের নানারকম মন্তব্য কানে আসে।

ভাবছে, কোন্ জাত কি বৃত্তান্ত—মন্তর পড়ে শেষটা পতিত হবে নাকি?

না পড়াতে চায়, স্পষ্টস্পষ্টি বলে দিক! তারপরে ক্ষমতা থাকে তো মন্তর আদায় করে ছাড়ব।

মন্তর মুখস্থ নেই, চকচকে পৈতের বাহার তো খুব!

পৈতে নয়—জালের সূতো গলায় পরে বেড়াও তুমি নাকি হে?

অসহায় প্রমথ নিঃশব্দে গালি হজম করছেন, এক একবার ঘাড় উঁচু করে দেখছেন চতুর্দিক তাকিয়ে। ঘরের গোলকধাঁধা। উঠে যদি দৌড় দেন তিনি এখান থেকে, এবং এরা কোন রকম বাধা না দেয়, তবু এই ধাঁধা অতিক্রম করে কিছুতে নদীকূলে পৌঁছতে পারবেন না। যত লোক এসেছে বিয়ে উপলক্ষে, সবাই যেন এক এক পালোয়ান—মেয়ে এবং শিশুগুলো পর্যন্ত। যে-কেউ একখানা হাত চেপে ধরলে নড়বার শক্তি থাকবে না।

অতএব জলচৌকি থেকে নেমে মরীয়া হয়ে বসলেন প্রমথ পুরুতের আসনে। যা ইচ্ছে পড়িয়ে যাবেন দু-দশটা অং-বং জুড়ে দিয়ে। উপায় কি তা ছাড়া?

কনের নাম বল—

দু-আঙুলে ঘোমটা একটুখানি ফাঁক করে মুখ টিপে হাসল বিয়ের কনে।

ভমর—ভমরমণি না তুমি?

রাগ ও আতঙ্ক গিয়ে এবার প্রমথর কৌতুক লাগছে। কাপড়-চোপড়ে মোড়া ভমর কতক্ষণ ধরে ঐ রকম আড়ষ্ট কনে-বউ সেজে বসে আছে! বেশ হয়েছে, আচ্ছা জব্দ ডানপিটে মেয়েটা! প্রমথ মন্ত্র অতি ধীরে ধীরে পড়াবেন—বিয়ে যাতে অনেকক্ষণ ধরে চলে, ভমরমণির ঘাড় ব্যথা হয়ে যায় নিচু হয়ে বসে থাকতে থাকতে।

আর বর হল্‌গে—ওহে ছোকরা, নাম বল তোমার—

বর সবিনয়ে নাম বলেঃ শ্রীঅম্বিকাচরণ বিশ্বাস।

একজন পাশ থেকে বলে দিল, ওরে অম্বিক, গড় কর্। আরে, আরে—ন্যাড়া হাতে হয় নাকি! ও যদুপতি, ভাইয়ের হাতে একটা টাকা দিয়ে দাও।

পায়ের গোড়া থেকে প্রণামী টাকাটা তুলে নেবেন কি—প্রমথ সবাক হয়ে অম্বিক বিশ্বাসকে দেখছেন। রোগাপটকা তামাটে রঙের নিতান্ত এক ছোকরা—অম্বিক বলে বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন।

ইয়ারগোছের একজন—অম্বিকেরই অন্তরঙ্গ হবে—পান-খাওয়া দু-পাটি দাঁত মেলে হাসতে হাসতে বলে, অম্বিককে ধরবার জন্য তল্লাট তো চষে ফেলছেন। হেঁ-হেঁ—খবর রাখি আমরা হালদার মশায়।

প্রমথ শুষ্ক মুখে প্রতিবাদ করেন: না রে বাবা। আমার বয়ে গেছে! আমি কেন ধরতে যাব? আমি কি জলপুলিশ?

আপোষে ধরা দিল এবারে। ভমরমণি ধরে ফেলল। নিজের চোখে দেখে যাচ্ছেন। বলবেন একথা পুলিশের কাছে।

বলে রসিকতার আনন্দে সে হেসে উঠল। প্রমথর কেমন মনে হল, বাদাবনের মধ্যে সেই সন্ধ্যায় ভীমরাজ পাখির মতো হাসিটা।

রাত কেটেছে। প্রভাতের শান্ত নির্মল আলো। আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই। ঝড়ের সেই উদ্দাম নদী এখন কাঁচা রোদে ঝিলমিল করছে। একঝাঁক বক উড়ে যাচ্ছে নদী পার হয়ে ধানবনের উপর দিয়ে অদূরে আরণ্য ভূমির দিকে। তাদের উড়ন্ত ছায়া নিস্তরঙ্গ নদী-জলের উপর দিয়ে পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চরণদাস ও প্রমথ বোটে এসে উঠলেন। মুখ-বাঁধা একটা হাঁড়িতে চরণদাস নাড়ু নিয়ে এসেছে দাঁড়িদের জন্য। প্রমথর হাতে চুরি-যাওয়া বন্দুকটা। দক্ষিণান্তের সময় যদুপতি দশ টাকা দিয়েছে। অম্বিক বিশ্বাস সেই সময়টা বন্দুক এনে পদপ্রান্তে রেখে দিল।

বোট ছাড়ল। চরণদাস বড় খুশি। অভাবিত ভাল খাওয়া-

দাওয়া হয়েছে রাত্রে, প্রচুর আদরআপ্যায়ন। ভরপেট নাড়ু খেয়ে দাঁড়িদেরও স্ফূর্তি খুব। হাতে হাতে হুঁকো চলছে, চরণদাস অবধি পৌঁছল। বগল এবং একটা পায়ের সহযোগে হাল ধরে আয়েস করে সে তামাক খাচ্ছে। কয়েক টান টেনে প্রমথর কথা মনে পড়ল।

ইচ্ছে করবেন নাকি কর্তা?

প্রমথ জবাব দিলেন না। ভাঁটা সরে জল দূরবর্তী হয়েছে, অনেকটা কাদা ভেঙে বোটে উঠতে হল। গলুইয়ে পা ঝুলিয়ে বসে তিনি কাদা-মাখা পা ধুচ্ছেন। ধুচ্ছেন তো ধুচ্ছেনই—আর তাকিয়ে রয়েছেন বকডোবার অপস্রয়মাণ বসতিগুলোর দিকে। চরণদাসের জবাব দিলেন না। কানেই যায় নি হয়তো তার কথা।

সহসা তিনি পুলকিত হয়ে উঠলেন। যা ঐ বলেছিল—ধরা পড়েছে বটে অম্বিক, ভ্রমরমণির নাগপাশে বাঁধা পড়েছে। ভাল হয়েছে, বড় শক্ত ঘানি। পলাপলি খাটবে না ও-মেয়ের কাছে। কাজকর্ম ফেলে প্রমথদের আর উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটতে হবে না অম্বিকের পিছু-পিছু। অম্বিকের বিয়েয় পৌরোহিত্য প্রমথর পক্ষে অপমানের বটে, কিন্তু অম্বিকও জব্দ হয়েছে মোটের উপর। তাঁরা এর সিকির সিকি জব্দ করতে পারতেন না। বড় জোর মাস ছয়েকের জেল হত—আর এই কয়েদখানায় থাকতে হবে সমস্ত জীবনকাল। বুঝতে পেরে, অম্বিক তাই চোরাই-বন্দুক ফিরিয়ে দিল।

প্রসন্নকণ্ঠে হাঁক দিলেন, ওরে বাবা চরণদাস, কলকেটা দিস একবার। আছে-টাছে কিছু?

বিয়েবাড়ি

শানাই বাজে যেন! শুনতে পাও? কান পাত, সুরের মধ্যে গানের কথাও কিছু ধরতে পারবে। বিয়েবাড়ি ঐ যে, চলে এস—

বিয়ের আগের দিন। গায়ে-হলুদ দুপুর বেলা। নিকানো তক-তকে পাছ-দুয়ারে চারটে কলার বোগ। ঢোল, শানাই। পাড়ার বউ-ঝি সব এসেছে। কাজকর্ম সারা হল তো কি—দুপুরে কেউ আজ বাড়ি যাবে না। খাওদাও, শোয়া-বসা কর। মানুষ জমবে না তো বিয়েবাড়ি কিসের!

জল ঢালাঢালিতে উঠান কাদা-কাদা হল যে! সবাই আছাড় খাবে এর পরে। পরনের শাড়ি তেল-হলুদে মাখামাখি। কনের নাম মায়ারাণী—সে আবার নিজের গায়ের হলুদ খানিকটা নিয়ে বড়-ভাজকে মাখাচ্ছে। ও মা, কী কাণ্ড! ও ঠাকুরঝি, আমাদের কি জন্যে? আমরা তো কবে এসব সারা করে এসেছি।

পিসিমা চেঁচাচ্ছেন: সবাই এই রঙ্গে মেতে থাকলে হবে? এস তোমরা। নাড়ু-কোটা আছে—সকলকে নিয়ে সেই জোগাড়ে চলে যাও বড়বউমা।

সকলে নয়, আধা-বয়সি ক'জন ঢেঁকিশালে গেলেন। ফচকে ছুঁড়িগুলোর উপর ভরসা করা যায় না। হাসাহাসি করতে করতে ঢেঁকির ছেয়ায় দিল হয়তো হাত থেঁতো করে। রীতকর্মগুলো সকলের আগে। পাঁচটা আস্ত পান, পাঁচটা গুয়া আর তেল-সিঁদুর রেখে দাও গড়ের কাছে। চাল-তিল-নারকেল এক সঙ্গে মিশিয়ে কোট এইবারে। এয়োস্ত্রীরা পাড় দাও, বিধবা কেউ ঢেঁকিতে পা ছোঁয়াবে না। ঢ্যা-কুচ-কুচ, ঢ্যা-কুচ-কুচ—ঢেঁকির মাথা উঠছে আর পড়ছে।

হয়ে গেছে, হয়ে গেছে—ওলো বড়বউ, আর কতক্ষণ! চটচটে

কাদার মতন হল কি না, হাতে তুলে দেখ। গুড় মিশিয়ে গোল গোল করে পাকিয়ে সর্ষের তেলের খোলায় ফেল এইবার। প্রথম খোলার নাড়ু হাঁড়িতে ভরে সিকেয় টাঙিয়ে রাখতে হয়। মায়ারাণী শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরবে, সিকের নাড়ু নামানো হবে সেই দিন।

নাড়ু ভাজার গন্ধ ভুরভুর করছে। ছেলেপুলে ছুটেছে নাড়ুর লোভে। নোনা-ধরা সেকেলে ইটের দালান এক দিকে; আর তিন পোঁতায় চৌরিঘর। সামিয়ানা খাটিয়েছে—আকাশ ঢেকে গেছে, বেশ কেমন ঘর-ঘর দেখাচ্ছে উঠানটা। ছেলেপুলে এক জায়গায় হলে রক্ষে আছে! সময়ের অপব্যয় না করে কুমির-কুমির খেলছে এই ফাঁকে। দালানের রোয়াক আর ঘরের দাওয়া তিনটে যেন ডাঙা; আর উঠান হল জল। কুমির হয়েছে জন দুই। দক্ষিণের ঘরের পৈঠা আর পূবের ঘরের পৈঠা দিয়ে নামছে সব উঠানে। যেন জলে নেমে এল। ভুচুত-ভুচুত, ঝাপুস-ঝুপুস মুখে চানের আওয়াজ—শব্দসাড়া করে ডুব দিচ্ছে যেন গাঙের জলে। পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠসে, তোমার শ্বশুর বলে গেছে বেগুন কোটসে—যেমন ওরা শোলোক বলে থাকে গাঙে চানের সময়। দু-হাত উঁচু করে সাঁতারও কাটছে—সাঁতার কেটে উঠান-নদী পারাপার হবে। অর্থাৎ এক ঘরের দাওয়া থেকে উঠবে গিয়ে আর এক দাওয়ায়। কুমিরেরা ওৎ পেতে আছে, ছুটেছে ধরবার জন্য। ছুঁয়ে ফেললেই মরা। যে মরে তক্ষুনি সে কুমির হল; যে মারে সে হয়ে গেল মানুষ। ধুপধাপ ছুটোছুটি, হাসি-চিৎকার। হতে হতে ঝগড়াঃ দেখ না মিথ্যে-মিথ্যে আমায় মরা করেছে। ছোঁয় নি, কিছু না—

মিথ্যে-মিথ্যে? বেশ, এই বারে? এবারে কি বলবি?

উঃ, চটাস করে চাপড় কষে দিল। ও মায়া-দিদি, তুই তো দেখছিস সব। বল। ছুতো করে মারল না?

পাড়ার মুরুব্বিরা এসে বসেছেন রোয়াকের উপর। মুহুর্মুহু

তামাক চলছে। জরুরি কথাবার্তা। বাইরে থেকে কাল অতগুলো ভদ্রলোক বরযাত্রী হয়ে আসছে। গ্রামের সকলে কন্যাযাত্রী। কন্যা-যাত্রী নিয়ে ভাবি নে। এরা নিজেদের লোক—জিনিষপত্র বাড়তি থাকলে খাবে, নয় তো বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসবে। তা নিয়ে বাইরে কোন কথা যাবে না। ভাবনা বরযাত্রী নিয়ে। বর সামলানো সোজা, বরযাত্রী নিয়ে যত হাঙ্গামা। লাটসাহেব এক-একটি। তুটো দিনের লাটসাহেব—পান থেকে চুনটুকু খসেছে তো রক্ষে নেই। কন্যা-পক্ষকে জব্দ করতেই যেন আসা—যতক্ষণ আছে, ছুতো শুঁকে শুঁকে বেড়াবে। এখন শীতকালের দিন—লেপ চাই সকলের একটা করে। বালিশ তো চাই-ই, পাশবালিশের বায়না তুলবে কেউ কেউ। কার বাড়িতে কি বিছানা আছে, ফর্দ করে ফেল দিকি। প্রফুল্ল বরঞ্চ কাগজ-পেন্সিল হাতে করে এ-পাড়ার বাড়িগুলো একবার ঘুরে এস—কোন বাড়ি ক-জন গিয়ে শুতে পারবে। গ্রামের মানুষ কাল বিনা লেপে বিনা বালিশে শোবে। খাটাখাটনিতে রাত কেটে যাবে, শোবেই বা কোন সময় !

এর মধ্যে বিপ্রদাস বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ ছ্যামড়া-ছেমড়িগুলো যেন গলায় বাঁশ দিয়ে চেঁচাচ্ছে। ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় কিছু করতে দেবে! এই হতভাগারা, গিয়ে পড়ি তো ঠ্যাং ধরে এক-একটাকে গোলার পিলপেয় আছড়াব। এই বলে রাখলাম।

তারকেশ্বর বলেন, ছেলেপুলে উঠানে খেলা করছে, তাতে আমাদের কি! বিয়েবাড়ি এসে মুখ বুঁজে থাকতে বললে শুনবে কেন? তিনটে দিন তো মোটে—আজ কাল পরশু। তরশুদিন থেকে যে যার ঘরের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে কোষ্টা কাটছি। হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল। বরযাত্রীদের মধ্যে কুলীন-মৌলিক থাকবে, সে এক বিচারের কথা বটে!

বিপ্রদাস বলেন, কুলীন কতজন আসছেন, তার কোন হিসাব চেয়ে

পাঠিয়েছে? হীরালাল গেল কোথায়? কুলীন-বিদায়ের একটা ব্যাপার আছে, খেয়াল রাখতে হবে।

প্রফুল্লর বয়স যা-ই হোক চালচলন ও কথাবার্তায় তিনি পরম আধুনিক। তিনি বললেন, ও-সমস্ত সেকালে হত মেজকাকা। আজ-কাল উঠে গেছে। শহরের হোটেলে ছত্রিশ জাতে এক হুঁকো টানছে, একসঙ্গে বসে পংক্তি-ভোজন করছে। জাতই রইল না, তা জাতের ভিতর কুলীন আর মৌলিক!

বিপ্রদাস চটে বললেন, শহুরে কাণ্ডকারখানা ছেড়ে দাও বাপু। গাঁয়ের মধ্যে সবই আছে। গাঁয়ের সমাজে যতক্ষণ আছি, রীতি-নিয়ম মানতে হবে, এক কথায় কেটে দেওয়া যাবে না।

কনের বাপ হীরালাল বাটায় করে পানের খিলি এনে রাখলেন। বিপ্রদাস বলেন, তোমায় খুঁজছিলাম হীরালাল। বিবেচনা কর, আমরা হলাম মৌলিক। বেশি হোক কম হোক মর্যাদা না দিলে কোন কুলীন আমাদের বাড়ি পাত পাড়বে না। প্রফুল্ল বলছে, দরকার নেই। তাই যদি ভেবে থাক, যজ্ঞি পণ্ড হবে কিন্তু।

হীরালাল সভয়ে বলেন, না প্রফুল্ল, বিপ্পুরদা'র কথাই ঠিক। হাত-পা ধরে মর্যাদার মাপ চাইতে পারি, কিন্তু চেপে থাকলে খারাপ হবে।

দরদালানের ভিতর থেকে হীরালালের মা নিস্তারিনীর চিঁ-চিঁ গলার আওয়াজ আসে: হীরেলাল, তুই শুতে যা।

বিপ্রদাস বলেন, শোন জেঠাইমার কথা। কালকে কন্যাদান, বাড়ির উপর এত বড় সমারোহ—ছেলেকে উনি শুয়ে পড়তে বলছেন।

হীরালাল বলেন, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। বুড়ো হলে বাহাত্তুরে হয়। তা হলে বিপ্পুর-দা, কুলীন বরযাত্রীর একটা ফর্দ চেয়ে পাঠানো উচিত।

বুড়ি আবার বলেছেন, রাত হয়েছে। অনেক রাত হয়ে গেছে, শুয়ে পড় হীরেলাল। কাসছিলি তখন—বউমাকে ডেকে নিয়ে যা, পায়ের তলায় গরম তেল মালিশ করে দেবে।

হীরালাল তাড়া দিয়ে ওঠেনঃ কাজে ভণ্ডুল দিও না মা। চুপ করে থাক।

ভাজা-নাড়ু ঝাঁঝরি দিয়ে তুলে তুলে বারকোশে কাঁড়ি করছে। খেলা ভেঙে ছেলেমেয়েরা ছাঁচতলায় গিয়ে ভিড় করল। পিসিমা বাঘের মতো গিয়ে পড়েনঃ তুই ছেলের মা হলে, তবু তোমার কাণ্ডজ্ঞান হল না। বড়বউ! আব্যুতিকের ষষ্ঠীপূজোয় নাড়ু লাগবে—মা-ষষ্ঠীর নামে তুলে রাখ আগে। দ্বিরাগমনের জন্যে রাখ। রীতকর্ম না সেরে আগ ভেঙে নাড়ু দিচ্ছ কোন বিবেচনায়?

কী বিপদ, রীতকর্ম সারতে সারতে রাত তো কাবার হয়ে যাবে। একটা নাড়ুর জন্যে ছেলেপুলে হাঁ করে থাকবে ততক্ষণ!

তাড়া খেয়ে ছেলেপুলে আবার উঠানে সামিয়ানার তলে গেছে। মায়ারাণী উত্তরের ঘরের কবাট ধরে দাঁড়িয়ে।

এস না মায়া-দি। পুণ্টুলকে কেউ কুমির করতে পারে না, তুমি এস দিকি। গাছকোমর বেঁধে নেমে পড়। তোমার সঙ্গে কেউ ছুটে পারবে না।

লোভী দৃষ্টিতে তাকায় মায়ারাণী। কিন্তু বিয়ের কনে—লোকে কি বলবে! আর পিসিমা ঐ যে চোখ-কটমট করে সকল দিকে নজর রেখে বেড়াচ্ছেন। খেলাধূলোর পাট চুকে গেল—কী বাপের বাড়ি, কী শ্বশুরবাড়ি! মায়ারাণী ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। চোখে দেখে মন খারাপ করা শুধু।

পেট-কাটা ঘরের পৈঠায় দাঁড়িয়ে পিসিমা বলছেন, ঠাকুরমশায় আছেন এখানে?

দাবা খেলছে দু-জনে, ও হরি, একজন তার মধ্যে হেমন্ত—মায়ারাণীর বড়দাদা। অপরটি হল পচা—দাবা খেলে আর দেহচর্চা করে। মারামারিতে পচার জুড়ি নেই। বিদেশি বরযাত্রীদের সঙ্গে দাবা খেলে যুঝবে, সেজন্য তড়পে বেড়াচ্ছে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে যাবার

পর থেকে। যাকে পায়, টেনেহিঁচড়ে খেলায় বসিয়ে অভ্যাস পাকা করে নিচ্ছে। পচার হাত এড়ানো যায় না।

নিঃশব্দে খেলা চলছে। হ্যারিকেন জ্বলছে পাশে—আলো চোখে না লাগে, সেজন্য কাচের গায়ে পুরানো পোস্টকার্ড গোঁজা। অল্প আলোয় পিসিমা আগে ঠাহর করতে পারেন নি। তা ছাড়া ভাবতেও পারা যায় না, রাত পোহালে যে বাড়ি তোলপাড় লেগে যাবে, পাড়ার লোকে এসে পড়ে কাজকর্ম করে দিচ্ছে—নিশ্চিন্তে দাবায় বসেছে সেই বাড়ির বড়ছেলে।

রাগ করবেন কি, পিসিমা হতভম্ব হয়ে গালে হাত দিয়ে রইলেন ক্ষণকাল। বলেন, বলিহারি আক্কেল তোর হেমন্ত!

হেমন্ত এখন ঘোরতর বিপদের মধ্যে। প্রতিপক্ষের ব্যূহের মধ্যে তার মন্ত্রী ঢুকে পড়েছে। সরানো যাচ্ছে না, রেখে দিলেও দু-চাল পরে মারা পড়ে যায়। এরই মধ্যে পিসিমা এসে পড়ে চেঁচামেচি করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছেন। হেমন্ত বলে, কোন কাজটা ফেলে এলাম বল পিসিমা। গোয়ালে লুচি ভাজার উনুন খুঁড়ে উনুনের পাশে কাঠকুটো গাদা করে রেখে এই সবে বসেছি। আবার এক্ষুনি জেলে নিয়ে মাছ ধরতে ছুটব। এক-হাত একটু জিরিয়ে নিচ্ছি, অমনি তোমার চোখ-টাটানি!

পিসিমা আগুন হলেন: সারা রাত্তির ধরে জিরোও না বাপু। জেলের সঙ্গে না যেতে চাও, তা-ও বল। রঘুর ছেলেটা কলকাতা থেকে এসে পড়েছে। কাজ-কাজ করে বেড়াচ্ছে—বলে, পিসিমা কি করতে হবে বল। তাকে বললে সোনা হেন মুখ করে জেলেদের সঙ্গে যাবে। কাজ আটকে থাকবে নাকি? তোমাদের কাছে আসি নি বাবা। ঠাকুরমশায় কোন দিকে গেলেন, তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

পচা মুখ তুলে জবাব দেয়, না, কই—আমরা তো আছি সন্ধ্যে থেকে, ঠাকুরমশায় থাকলে কী আর দেখতে পেতাম না?

দাওয়ার কোণে তক্তাপোশ পাতা, কাচনির বেড়ায় ঘেরা

জায়গাটা। তক্তাপোশের উপরে গায়ের কম্বল সরিয়ে ফেলে পুরুত-ঠাকুর তড়াক করে উঠে বসলেন: নেই কি রকম! রয়েছি আমি দৈব-দিদি। এই যে, এখানে। আচ্ছা মানুষ সব! সামনের উপর দিয়ে উঠে এলাম—জলজ্যান্ত মানুষটাকে নেই বলে উড়িয়ে দিচ্ছে।

পচা বলে, দেখি নি তো আপনাকে—

দেখ নি সেটা বুঝেছি। দাঁড়ালাম একটু তোমাদের খেলার পাশে। তা কথাবার্তা না বললে, পায়ের ধূলোটা অবধি নিলে না। তখনই জানি, চোখ মেলা বটে, দেখতে পাচ্ছ না কিছুই। কাল তো বিস্তর ঝামেলা, লগ্ন সেই রাত দেড়টার পরে। ঘুমের দফা গয়া। সেইজন্যে ভাবলাম, আজকে ঘুমিয়ে নিই মনের সাধে।

পিসিমা বলেন, উনুন ধরানো হয়েছে ঠাকুরমশায়। এই বারে এসে চাট্টি মুগের ডাল চাপিয়ে দেন।

পুরুতঠাকুর হাই তুলে বলেন, কড়াইটা ভাল করে ধুয়ে তুমিই চাপিয়ে দাও দৈব-দিদি। ওতে দোষ নেই। ঘোঁটাঘুঁটি করতে যেও না। আর করলেই বা কি! নুন না পড়া পর্যন্ত এঁটো হয় না।

আবার হাই তুলে পুরুতঠাকুর মুখের সামনে তিন বার তুড়ি দিলেন।

এতক্ষণে হেমন্ত পুরুতের দিকে মুখোমুখি চেয়ে বলে, মুগ কেন, মটরের ডাল চাপিয়ে দাওগে পিসিমা। আসিদ্ধ মটর অনেকক্ষণ ধরে হবে। ঠাকুরমশায় ততক্ষণে আর এক ঘুম ঘুমিয়ে নিতে পারেন।

পুরুতঠাকুর কিন্তু উঠে পড়েছেন। হেমন্ত দেখেছে এবার, এমন কি রঙ্গরসিকতাও করল—খড়ম খটখট করে কাছে গিয়ে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। দু-পায়ের বুড়োআঙুল ইঙ্গিটাক উঁচু করে তুলেছেন খড়মের উপরে। ধূলো না থাকলেও আঙুলের নিচে হাত ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকানোর বিধি। কিন্তু কোথায়! ঘাড় নিচু করে হেমন্ত আর পচা যথাপূর্ব দাবায় মজে আছে।

পৈঠায় পা দিয়েছেন, সেই সময় পচা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে : চলে যাচ্ছেন—বাঃ রে, প্রণাম করা হবে না ? দাঁড়ান।—এই কিস্তি।

নৌকোটা দু-ঘর সরিয়ে দিয়ে হেমন্ত বলে, যাবেন না ঠাকুর-মশায়। এই সুস্থি—হল তো ? মাত করা আজকের রাতে হবে না।

দেখা যাক, আজ রাতে হয় কি ক'টা রাত্তির লাগে !

পুরুতঠাকুর রাগ করে উঠলেন : আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব, আর সারা রাত্তির তোমরা কিস্তি-সুস্থি চালাবে ?

পচা মুখ বাঁকিয়ে বলে, কী আমার রাজা রাজবল্লভ রে ! দু-মিনিট দাঁড়িয়ে তালুকমুলুক নিলাম উঠে যাচ্ছে ? বলছি, প্রণাম করব—তা যেন ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে আছেন। বলি, মাংনা কাজ করবেন—চালে কাপড়ে নগদ-দক্ষিণেয় ভরা সাজিয়ে নিয়ে যাবেন না ?

দাবার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে কিঞ্চিৎ ঘাড় বেঁকিয়ে দু-জনেই যুগপৎ পদধূলি নেবার পর পুরুতঠাকুরের অব্যাহতি হল।

গোয়ালা ঘোষ পিসিমার পিছু পিছু ভিতর-বাড়ি ছুটেছে। রোয়াকের নিচে থেকে ডাকে : ও পিসিমা, কোথায় গেলে আবার ? এই যে, কর্তাবাবুই তো এখানে। মাদুর আর কম্বল চাই দুটো দুটো করে।

বিপ্রদাস ব্যঙ্গ করে বলেন, ও আমার লাটসাহেব গো ! শুধু মাদুরে হচ্ছে না,তার উপরে কম্বল পাততে হবে। আর লেপ-তোষকের কথা বলছ না যে ঘোষ মশায় ?

ঘোষ বলে, আমার শোবার জন্যে নয়, দই ঢাকবার বিছানা। ঢাকা দিয়ে দই জমাব।

হীরালাল বিরক্ত হয়ে বলেন, দই আর জমেছে তোমার ! ভোজের সময় একখানা কেলেঙ্কারি ঘটাবে। দুধ সম্পূর্ণ জোগাড় করতে পারে নি—তাই করল কি বিপ্লুর-দা, জল ঢেলে ঢেলে দুধের পূরণ দিল। অত জলে দই জমে কখনো ! ঘোল খাওয়াবে কাল কুটুম্বদের।

ঘোষ মশায় জাঁক করে বলছে, জমে কি না কালকে দেখে নিও মশায়রা। সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে হাঁড়ি উপুড় করে দই কেটে দেব। নন্দ ঘোষের দই কেউ তো আজ অবধি নিন্দে করতে পারল না। এ তবু বিস্তর দুধ হল—শুধু জল জমিয়ে দিতে পারি। পুকুরসুদ্ধ জমানো যায়, তেমন-তেমন বিছানার সরবরাহ দিতে পার যদি। ও পিসিমা, কম্বল দু-খানা নয়, চারটেই দাও তবে। বাবুদের কাল দেখিয়ে দেব, কাকে বলে দই।

ওদিকে নিস্তার-বুড়ি কাতরাচ্ছেন: ও হীরেলাল, শুতে যা। কিছু ভাবতে হবে না তোর। পাড়ার বাবাসকল যখন এসে পড়েছে, ওরাই সমস্ত করে দিয়ে যাবে। বউমাকে নিয়ে যা—পায়ে মালিশ করে দেবে।

হীরালাল বলেন, জ্বালাতন, জ্বালাতন! মা তুমি চুপ করবে কি না বল। আর নয়তো পেট-কাটা ঘরে গিয়ে আমরা কাজ করিগে।

মানুষ এমনিই কিলবিল করছে। বিয়ের দিন সকাল থেকে আরও সব এসে হাজির হচ্ছেন।

হরি-দা এলেন। লম্বা-লিকলিকে মানুষটা, পাকা-চুল পাকা-গোঁফ—দেহের মধ্যে পেটটাই নজরে পড়ে সকলের আগে। এই হলেন হরি-দা। পেটই যেন আসল বস্তু—পেট চলেফিরে বেড়াবে বলেই যেন পেটের নিচে একজোড়া পা এবং পেটের উপরিভাগে সুপারিপ্রমাণ একটি মাথা ও চোখ-কান। যে বাড়ি ভোজ, হরি-দা সেখানে। নিমন্ত্রণ লাগে না। হরি-দা ভোজ ধরতে যাচ্ছেন, সেই সময়ের হাঁটা যদি দেখেন! কোল-কুঁজো মানুষটা খাড়া সরলরেখা হয়ে গেছেন—সাঁ-সাঁ করে ছুটছেন বাতাসের বেগে। সামাজিক আসরে বসে সমারোহে ভোজ তো খাবেনই—আবার ভোজের আগে আগ-ভোজ, ভোজের পিছে বাসি-ভোজ রয়েছে। ক্রিয়াকর্মের বাড়ি মিষ্টিমিঠাইয়ের ভিয়ান হয়ে গেছে, মাছ ধরে এনে গাদা করছে উঠানে, গোয়ালা হয়তো খান দুই দইয়ের হাঁড়ি এনে দিল পরখ করে দেখবার জন্য। দু-চারটে মিষ্টি,

দু-চার দাগা ভাজা-মাছ, দু-এক হাতা দই সহযোগে অতিথিকুটুম্বর সাধারণ খাওয়াটাও পরম উপাদেয় হয়ে ওঠে। এই হল আগ-ভোজ। আর ভোজের ব্যাপার চুকেবুকে যাওয়ার পরে জিনিষ কিছু বেশি হবেই—বাসি-ভোজে সেইগুলো পাতের কোলে এসে পড়বে। খাইয়ে মানুষ হলে সবগুলো ভোজ চেটেমুছে সারা করে তবে কাজের বাড়ি থেকে নড়বেন।

তল্লাটের সকল লোকে চেনে হরি-দা'কে। হরি-দা ছুটেছেন তো ছেলেপুলে খেলা ছেড়ে রাস্তায় এসে জুটল হরি-দা'র আশেপাশে। জোয়ানযুবারাও পিছু নিয়েছে। চাষীরাও, এমন কি গোনের মুখে, লাঙল ছেড়ে দৌড়ে এল মজা দেখবার জন্য।

হাত-পা শলা-শলা,
পেটটা ঢালাই জালা—

অতদূর বলতে হবে না। 'হাত-পা' কথাটুকু শুধুমাত্র মুখ দিয়ে বেরিয়েছে কি না বেরিয়েছে—হরি-দা লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে এসে পড়বেন সকলের মধ্যে। সামনে যে পিঠখানা, তার উপরে বাড়িও পড়ল দু-একটা। কিন্তু মার খেয়ে রাগ করে না কেউ, সরে গিয়ে আবার ছড়া কাটে। হরি-দা'ও ছাড়বেন না, ছুটলেন সেদিকে। ইতিহাস আছে নাকি পিছনে। এক-বয়সে হরি-দা'র বিয়ের ঝোঁক হয়েছিল। কিন্তু বরের আকৃতি দেখে কন্যা ঘরে দুয়োর দিল। 'হাত-পা শলা-শলা'—বর্ণনাটা নাকি কন্যারই মুখের। সেই জন্যে আরও হরি-দা'র রাগ।

আরও একটু বেলায় বিলপারের গ্রাম থেকে মায়ারাণীর বড়বোন ছায়ারাণী এসে পড়ল। শাশুড়ির অসুখ বলে আগে পাঠায় নি—বউ গেলে সংসারধর্ম দেখে কে? আজকেও ছায়ারাণী একরকম জোর করে চলে এসেছে: সংসার আছে বলে কি বোনটার বিয়ে দেখব না?

পালকি নামাল বাইরে বোধনতলায়। উঠানে আলপনা দিচ্ছে, আই গড়াচ্ছে—সমস্ত ফেলে মেয়ের দঙ্গল ছুটে এল। ছায়ারাণী

পালকি থেকে বেরিয়ে এসে ফিচ করে পানের পিক কাটে। পালকির মধ্যে এই বড় ডাবর ভরতি পান কাটা-সুপারি চুন-খয়ের—সারা পথ পান সেজে খেতে খেতে এসেছে। ছায়ারাণী নেমেছে তো তার পরে তার ছা-বাচ্চাগুলো নামছে। নামছে তো নামছেই। অফুরন্ত। গণলে পাঁচ ছ'টা তো হবেই। মাদারকাঠের এইটুকু এক পালকি—অতগুলো ঢুকিয়েছিল কেমন করে ওর ভিতর? রমজান কাহার বলে, তাই বোঝেন দিদিসকল। কাঁধের এক পর্দা ছাল উঠে গেছে। পালকির ডাঁটি ভাঙে নি সর্বরক্ষে—আমাদের গতরের উপর দিয়ে গেছে। একঘটি পানি যদি দিতেন দিদিঠাকরুন!

শীতকালেও গা-ময় ঘাম, গামছা নেড়ে নেড়ে তারা বাতাস খাচ্ছে। কিন্তু শতেক কাজকর্মের বিয়েবাড়ি—রমজানের কথা কে কানে নেয়! আইবুড়ভাতের জিনিষপত্র বেরুল পালকি থেকে। বড়বউ তুলে-পেড়ে রাখছে। বলে, বিস্তর জায়গা থেকে আইবুড়ভাত আসছে। সমস্ত এক জায়গায় রেখে দেব, সকলে একবারে দেখতে পাবে।

কাপড়-সেমিজ-সাবান-তরলআলতা ছাড়া আরও আছে। ছায়া ডাকছে, ও মায়ারাণী, ইদিকে আয় তো একবার। পার্শি-মাকড়ি গড়িয়ে আনলাম যশোর থেকে—প্যাটার্নটা নতুন উঠেছে। ফুল দুটো খুলে ফেলে পরে দেখ কেমন মানায়। বিয়ের কনের কানে একরত্তি ফুল মানাবে কেন? খুলে ফেল।

মায়ারাণী কান খালি করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মাকড়ি হাতে হাতে ঘুরছে সকলের।

বাঃ, খাসা জিনিষ, চমৎকার! হাতের তেলোয় গয়না রেখে হাত নেড়ে ওজনের আন্দাজ নেয়। চোখ ঠেরে ফিসফিসিয়ে বলাবলি হচ্ছেঃ কত আর—আধ ভরিও হবে না! ফঙ্গবেনে জিনিষ। পয়সা-কড়ি থাকলে কি হয়, ছায়ার বর কঞ্জুষ বড্ড। সে কি আর বেশি খরচা করবার মানুষ!

পিসিমা ভিয়েনের কড়াই থেকে একবাটি পান্তুয়া এনে ছায়ার

ছেলেমেয়েদের একটা করে দিচ্ছেন। রমজান বলে, অ পিসিঠাকরুন, পানির পিয়াস লেগেছে বড্ড—

র বাপু। ঘরের বাছারা তেতে-পুড়ে এল, তারা এখনো ঠাণ্ডা হতে পারল না। তোদের বায়নাক্কা কে কুলোয়! অমন পুকুরঘাট রয়েছে—যত ইচ্ছে খেয়ে আয় গিয়ে সেখানে।

পাড়াময় আইবুড়ভাত দেবে। অমন বিশ ঘর গৃহস্থ। আইবুড়ভাত উপলক্ষ করে সবাই চাট্টি ভাত খাইয়ে দিতে চায়। আহা, গাঁয়ের মেয়েটা পরঘরি হয়ে যাচ্ছে! নতুন শাড়ি পরিয়ে মায়ারাণীকে সামনে বসে খাওয়াবে। কিন্তু মুশকিল, গায়ে-হলুদ হয়েছে সবেমাত্র কাল। গায়ে-হলুদের আগে আইবুড়ভাত চলে না। আর বিয়ের দিন আজকে তো কনের উপোস। তাহলে মাত্র একটা বেলা পাওয়া গেল কনেকে ভাত খাওয়াবার। কার বাড়ি খাবে, আর কার বাড়ি খাবে না—মন-কষাকষির সৃষ্টি নিরর্থক। পিসিমা তাই বলে দিলেন, বাইরে কোথাও খাবে না। ও-বেলা গৃহস্থের সংসারে খেয়েছে,এ-বেলা আমার নেমন্তন্ন। আমি তো সত্যি সত্যি এদের সংসারের নই। পাড়ার সবাই কনে ডেকে নিয়ে খাবার খাইয়ে আইবুড়ভাত দাও। উপায় কি তা ছাড়া?

আইবুড়ভাতের কী ধুম পড়েছে সেই কাল দুপুর থেকে! আজকেও জের মিটল না। মায়ারাণী কী যেন হয়ে পেছে হঠাৎ! একদণ্ড বাড়ি বসতে দেয় না—এক বাড়ি থেকে সেরে এল তো অন্য বাড়ির ডাক: চলে এস মায়া, তোমারে খুড়িমা সেই কখন থেকে বসে আছে। দেরি কোরো না।

মায়ারাণী ভাই, এক বাড়িতে অতক্ষণ কাটালে চলে আজকের দিনে—অন্য সকলের তবে কি হবে?

এটা খাও ওটা খাও বলে পীড়াপীড়ি: ওমা, এর মধ্যে হয়ে গেল! অত রাত অবধি বসে বসে গোপালভোগ তৈরি করলাম কার জন্যে? একটুখানি মুখে দিতেই হবে।

মায়ারাণী কাতর হয়ে বলে, তিন বাড়ি খেয়ে এলাম বউদি, আর পারব না। এমনি হয়েছে, খাবার মুখের কাছে আনলে পেটের মধ্যে ঘুলিয়ে আসছে।

ঠিক দুপুরে রোদে পুড়ে এক-পা ধুলো নিয়ে ঘটক এসে হাজির।

খবর ভাল ঘটক মশায় ?

ভাল ছাড়া মন্দ কেন হতে যাবে ? বটতলার ঘাটে নৌকো বেঁধে বরযাত্রী সব হরিবাড়ি খাওয়াদাওয়া করবে। ঘোর হয়ে গেলে বাজি-বাজনা করে বিয়েবাড়ি আসবে। সমস্ত ঠিক আছে। কিন্তু বরযাত্রী বোধ হয় কিছু বেশি হয়ে গেল। আর ব্রাহ্মণ আছেন দশজন—সাতজন তার মধ্যে সাত্ত্বিক, লুচি চলবে না। তাঁদের জন্য ছানা-চিনি।

তাতে অসুবিধা হবে না। খবরটা আগে দিয়ে ভাল করলেন ঘটক মশায়। আপনিও তো তেতে-পুড়ে এলেন, স্নান-আহ্নিক হোক এখানে।

ঘটক ঘাড় নাড়েঃ উঁহু। একলা আমি খেয়ে যাব, সেটা ভাল দেখায় না। হরিবাড়ি সকলের জন্য খিচুড়ি রান্না হচ্ছে।

দূর মশায়! পথে-ঘাটে খিচুড়ি হয় নাকি ? চালে-ডালে ঘুঁটছে, তাই বলুন। একটু জলটল খেয়ে যান, ওখানে গিয়েও খাবেন না হয় দু-এক গ্রাস।

ঢেঁকিশালের ঢেঁকি তুলে ফেলে মস্ত মস্ত দুই উনুন খুঁড়ে লুচি ভাজা হচ্ছে সেই সকাল থেকে। ধান-রাখা বড় বড় ডোল এনে সাজিয়েছে, লুচি ভেজে ডোল ভর্তি করছে। ভোজের খাওয়া রাত দুপুরে, হয়তো বা শেষরাত্রে। সময় ঠিক করে বলা দুরূহ—রাত পোহাবার আগে সমাধা হয়ে যাবে, এইমাত্র নিঃসংশয়ে বলা যায়। এত আগে থেকেই লুচি ভাজছে। খোলা থেকে গরম গরম ভেজে তুলে পাতের উপর দেবে, পাড়াগাঁয়ে এত সব বায়নাক্কা

নেই। সম্ভবও নয়। দেড়খানা ফুলকো লুচি ভেঙে মুখে দিয়ে ঢেকুর তুলে এক গেলাস জল খেয়ে ভোজের ইতি করবে, গেঁয়ো মানুষ আমাদের তেমন ধাতের পাবেন না। পদ্মপাতার সাইজের ইয়া ইয়া লুচি দু-কুড়ি আড়াই-কুড়ি তিন-কুড়ি অবধি টানবে এক এক জনে—কুড়ি হিসাবে গুণতি।

চতুর্দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘটক আয়োজন দেখে নিচ্ছে। মাছের কালিয়া দু-কড়াই নেমে গেল। আর কুমড়ার ছক্কা এক কড়াই। কড়াইয়ের দু-আংটার ভিতরে হুড়কোর বাঁশ ঢুকিয়ে চার জনে বয়ে এনে লুচির ডোলের পাশে রাখল। কুকুর কয়েকটা ছোঁক-ছোঁক করে এসেছে—চেলা-কাঠ ছুঁড়ে মারতে কেঁউ-কেঁউ করে পালাল। বেশ একটা গমগমে ভাব চারিদিকে।

দেখেশুনে পুলকিত কণ্ঠে ঘটক বলে, করেছেন কি, রাজসূয় আয়োজন যে মশায়! জল খেতে বলছেন—বড্ড ব্যস্ত এখন, পাতায় করে তাড়াতাড়ি চারখানা লুচি আর একটু তরকারি দিয়ে দেন।

মাছ দেব না?

দেন খান চারেক—

সন্দেশ?

দেন চারটে—

লেডিকেনিও আছে—

ঘটক চটে গিয়ে বলে, দেন না মশায় যা দেবার। অতশত জেরা কিসের?

মায়ারাণী ফিরল কোন বাড়ি থেকে আইবুড়ভাত নিয়ে। তিন চারটে সমবয়সি মেয়ে আশেপাশে। বড়বউদিদিকে ফিসফিস করে বলে, ও বউদি শোন, পেয়ারাতলায় তোমাদের কুটুম্ব।

বুঝতে না পেরে বড়বউ বলে, কোথাকার কুটুম্ব? কে?

বড়ভাই।

কার বড়ভাই?

মায়ারাণী হেসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল : যাও, আমি জানি নে। সেই যে দেখতে এসেছিল আমায়। হাঁটিয়ে চুল খুলে পায়ের নিচে ঝাঁটার কাঠি ঢুকিয়ে দেখে গেল।

তখন বুঝল বড়বউ। হেমন্তকে ঘরের ভিতর ডাকিয়ে এনে বলে কথাটা। ঘটক জলযোগে বসে গেছে। লুচির কাঁড়ি পাতে ধরছে না। হেমন্ত গিয়ে বলে, কুটুম্বকে পেয়ারাতলায় দাঁড় করিয়ে এলেন কেন ঘটক মশায় ?

অনিলবাবু ? হ্যাঁ, আছেন বটে দাঁড়িয়ে। ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে। আপনারা ছাড়েন না—এই আবার খেতে বসতে হল।

তাঁকে সঙ্গে করে ভিতরে আনেন নি কেন ?

আসতে চাইলেন না কিছুতে। দিনের আলো থাকতে নাকি কনের বাড়ি আসে না। বাঁক ঘুরে ঘুরে নৌকো যাচ্ছে—অনিলবাবুই বললেন, খেয়া পার হয়ে পায়ে হেঁটে আমরা হরিবাড়ি গিয়ে উঠি। ভারি দু-ক্রোশ পথ—খিচুড়ি খেয়ে আমাদের দিব্যি একখানা ঘুম হয়ে যাবে, ওরা তখন ঢিক-ঢিক করে পৌঁছবে। পাড়ার মধ্যে এসে বললেন, কাছাকাছি এসেছি যখন, ছানার কথাটা বলে এস। নয়তো ভদ্রলোকেরা মুশকিলে পড়তে পারেন।

ঘটক সেই যে বিয়েবাড়ি গিয়ে ঢুকেছে, একলা অনিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করে ফেলল। একটা ফুলো পেয়ারা ছিঁড়ে নিয়ে তাই চিবোচ্ছে।

হেমন্ত গিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল : এখানে কি করেন অনিলবাবু, বাড়ি আসুন।

এখন ?

বরের দিনমানে যেতে নেই, বরের ভাই কেন যাবেন না ?

আসুন—বলে হাত চেপে ধরেছে। যণ্ডা মানুষ হেমন্ত—আঙুলে যেন চামড়া-মাংস নেই, শুধু লোহা। অনিলের হাত মটমট

করে উঠল। গোটা মানুষটা যায় ভালই, নয়তো কুমিরের কামড়ের মতন এই ধরা-হাতখানা ছিঁড়ে নিয়েই বুঝি বাড়ি ঢুকবে।

অগত্যা অনিল বলে, পুকুরঘাট কোন দিকে ?

ঘাটের কি দরকার হল ?

বলেই হেমন্তর নজর গেল অনিলের পিঠের দিকে। দু-পাটি জুতোর ফিতে একত্র করে বেঁধে ছাতির মাথায় জুতো ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে।

হেমন্ত বলে, জুতো পরবেন ? খেয়া পার হয়ে দু-ক্রোশ পথ খালি-পায়ে আসা গেল তো এইটুকুর জন্য আর হাঙ্গামা করতে হবে না। চলুন।

যে ভাবে হাতটা ধরেছিল, তারপরে 'না' বলতে অনিলের সাহসে কুলায় না। কৈফিয়ৎ দিতে দিতে চলেছে : খালি-পায়ে না এসে কি করব ? যা ধূলো আপনাদের ইদিকে ! বুরুষ মেরে মেরে চকচকে-করা জুতো—পায়ে পরে থাকলে এ জুতোর বর্ণ খুঁজে পাওয়া যেত না মশায়। আমারই কী হয়েছে দেখুন না—কালোকোলো মানুষটা ধূলোয় ধূলোয় রীতিমতো গৌরবর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছি।

ঘটকের পাশে আরও একটা ঠাঁই হল—এবারে কলার পাতা নয়, কাঁসার থালা। চারিপাশে গোল করে সাজানো বাটি। হেমন্ত অনুরোধ করছে, কিন্তু শোনায় হুঙ্কারের মতো : বসে পড়ুন।

তারপর ঢেঁকিশালের দিকে চেয়ে বলে, পরিবেশন কে করছ ? কুটুম্বের এই প্রথম পাত পড়ে বাড়িতে, তা দেওয়ার শ্রী দেখ ! কুটুম্বকে অম্বলের রুগি ভেবে নিয়েছে। পোনামাছের বড় গামলাটা নিয়ে এস।

থালার উপরে হাত ঢাকা দিয়ে অনিল বলে, উঁহু, অনেক দিয়েছে, আর পারব না।

হেমন্ত দৃকপাত না করে বলে, বেছে বেছে আটখানা দাগা দাও। লাগে তো আবার পরেদেবে। চিংড়িমাছ নেমে গেছে তো ? নিয়ে এস।

অনিল আর্তনাদের মতো বলে, মরে যাব মশায়। উঠে আর হরি-বাড়ি অবধি যেতে হবে না।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে মায়ারাণী দেখছে। অনিলের অবস্থা দেখে হাসে খুকখুক করে। ঠিক হচ্ছে, রাগ আছে না বড়দার মনে! যা বলল মুখ দিয়ে, সত্যি সত্যি তাই যেন হয়ে দাঁড়ায়। উঠে যেতে না পারে পিঁড়ি থেকে—টেঁপামাছের মতো পেটটা ফটাস করে ফেটে যায়! কম কষ্ট দিয়েছে মেয়ে দেখবার সময়! গায়ের উপর আঙুল ঘষে ঘষে রং দেখেছে। হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে চলন দেখেছে। পায়ের নিচে দিয়ে শলা চালিয়ে খড়মপেয়ে কিনা পরখ করেছে। উঃ, কত রকম যে আসে লোকটার মাথায়! রান্নার পরীক্ষা অবশেষে—

আচ্ছা, কোন জিনিষ বাদ দিয়ে রান্না করা চলে না?

প্রশ্ন করে অনিল চতুর্দিকে সকলের উপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে বুদ্ধির বাহাদুরি জানান দেয়।

ঘামে নেয়ে উঠেছে মায়ারাণী। জবাব দিয়ে দিয়ে আর পারছে না। বলে, নুন।

হল না। ভাত রাঁধতে নুন লাগে নাকি? এমন বস্তু যার বিহনে কোন রান্নাই হবে না।

থতমত খেয়ে মায়ারাণী বলে, কাঠ—

উঁহু। শহরে তো কয়লা দিয়ে রান্না করে, কাঠ লাগে না। তবে?

মায়ারাণী বলে, আগুন।

হেমন্ত সামনে আছে এই কনে-দেখানোর সময়। রাগে সে গর-গর করছে। বাপ হীরালালও আছেন। বাপের সামনে বলেই হেমন্ত চুপচাপ আছে। এবারে সকলে খুশি। উত্তর ঠিক দিয়েছে মায়ারাণী। অন্য সমস্ত বাদ দেওয়া চলে—বিনা আগুনে রান্না হতে পারে না।

তবু কিন্তু মাথা নেড়ে দিল অনিল। বলে, আগেকার দিনে হলে বলতে পারতে বটে। না মেনে উপায় ছিল না। কিন্তু খবরের-কাগজে বেরিয়েছে, রোদের তাপ ধরে রান্না করেছে কোথায়।

মায়ারাণী আকাশ-পাতাল ভাবছে। অনিল তখন সদয় হয়ে উত্তর বলে দেয়ঃ মন। মন বিনে রান্না হয় না। এটা ধরে যাবে, ওটা পুড়ে যাবে রাঁধুনির মন যদি রান্নায় না থাকে।

বড়দার চোখের উপরেই এ সমস্ত হয়েছিল—তারই এখন শোধ তুলছেন। পুঁতে ফেলবেন খাইয়ে খাইয়ে—ভেবেছে কি ভাসুরঠাকুর!

শানাই বেজে উঠল, শোন। পোঁ-ও-ও—সুর ধরেছে। সেই সঙ্গে ঢোল আর কাঁসি। জল সইতে চলেছে পাড়ায়। এয়োস্ত্রী এক-জন জলের ঘট নিয়ে আগে আগে যাচ্ছে। নিয়েছে পানসুপারি সিঁদুর আর সর্ষের তেল। এক-একটা বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়ঃ কই গো, বাইরে এস বউ-ঝিরা। ঘটি বের কর, তেল ঢেলে দিই। ঘটিতে তেল দেয়, জায়গা দেখে পানসুপারি রাখে। বাড়ির সব এয়োস্ত্রীর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। গৃহস্থবাড়ি থেকে পালটা জল ঢেলে দেবে এদের ঘটে। বেশি নয়, একটুখানি। সব বাড়ি থেকে একটু একটু নিয়ে ঘট ভরবে। এ বাড়ি হয়ে গেল তো পরের বাড়ি। দল ভারি হচ্ছে ক্রমশ—প্রতি বাড়ির বউ-ঝিরা সঙ্গ নিচ্ছে। এমনি চলল। গোড়ায় বেরিয়েছিল পাঁচটি প্রাণী, জল-সওয়া শেষ করে বিয়েবাড়ি ফিরে এল, তখন আর গোণাগুণতি নেই। ঘট ভরতি জল—সকল বাড়ি ঘুরে ঘুরে কুড়িয়ে আনা। সকল গৃহস্থের আশীর্বাদ একটা ঘটের মধ্যে। বিয়ের আগে মেয়ের স্নান হবে ঐ জলে।

চণ্ডীমণ্ডপের চওড়া বারাণ্ডায় ফরাস হয়েছে। বর আর ছোকরা-বরযাত্রীরা সেখানে। ফষ্টিনষ্টি হচ্ছে, প্রবীণেরা ওর মধ্যে বসেন কি করে! তাঁদের কতক পেট-কাটা ঘরে, আর কয়েকজন চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর-দিকটায়। বরকর্তা মোটের উপর অনিলকেই বলতে হবে। দুপুরে সেই দেখেছিলেন, এখন চেহারা একেবারে আলাদা। তৈল-চিক্কণ চুলে এলবার্ট-টেরি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, শান্তিপুরে ধুতির ফুল-

কোঁচা পা ছাড়িয়ে মাটিতে লুটায়। দুপুরের সেই জুতো কাঁধ থেকে পায়ে নেমেছে—জুতো মসমস করে খুব ব্যস্তভাবে অনিল এদিকে-সেদিকে ছুটাছুটি করছে।

গেঁটে-বন্দুক দাগছে দড়াম-দড়াম করে। হাউইবাজি সোঁ-সোঁ করে আকাশ ফুঁড়ে উঠছে, চরকিবাজি পাক দিচ্ছে তারা কেটে কেটে। লোকে লোকারণ্য। কপালে কনেচন্দন, সর্বাঙ্গে গয়নাগাঁটি, আজ মায়ারাণীকে রাজরাজ্যেশ্বরী সাজিয়ে বসিয়ে রেখেছে। ধুপধাপ করে তিন-চারটে মেয়ে ছাতে উঠছে বাজি দেখবার জন্য। মায়ারাণীকে ডেকে বলে, তুই-যাবি নে? ভাল ভাল সব বাজি নিয়ে এসেছে। তোকে আর কে দেখতে পাবে ওখান থেকে? চলে আয়।

মায়া বলে, না ভাই, বড়বউদি বকবে।

দেখতে পেলে তো! ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে তিনি বিয়ের জিনিষ-পত্তোর সাজাচ্ছেন। এখন আর নড়বার জো নেই।

জোর করে টেনেটুনে মায়াকে ছাতে নিয়ে গেল। অনেক মেয়ে জুটেছে। মায়ারাণীও আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজি দেখছে। সমস্ত বাইরের উঠানটা ছাত থেকে দেখা যায়।

হঠাৎ এর মধ্যে অনুপমা বলে, ঐ যে সব বসে আছে—বর কোনটা বল দিকি ভাই?

মায়া বলে, আমি কি জানি?

উঁহু, ভাজা-মাছ উলটে খেতে জানেন না! বলতে পারিস তো—

মায়া বলে, কি দিবি আগে বল।

সবাই তো সব জিনিষ দিয়ে দিল। আচ্ছা, তাসজোড়াটা দিয়ে দেব আমার। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে খেলিস।

মায়া আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। অনুপমা হেসে খুন: চোখ খারাপ হয়েছে, চোখে চশমা ধর মায়া। এইটুকু উঁচু থেকে চিনতে পারলি নে?

ছায়ারাণীকে না দেখিয়ে পারে না। বলে, ছায়া-দিদি, শোন। ঐ

যে মানুষটা আসছে—মায়া বলছে ঐ নাকি বর। চোখে বর না-ই দেখুক, আক্কেল-পছন্দ থাকবে না ? বর হলে একা-একা অমনি ভিতর-বাড়ি চলে আসে !

ছায়ারাণী দেখে বলে, রঘু-কাকার ছেলে—ওকে চিনতে পারলি নে মায়া ?

নিশ্বাস ফেলে ছায়ারাণী আবার বলে, কলকাতায় পড়ে বলে পাড়াগাঁয়ে বিয়ে করতে মন হল না এখন। নয়তো কি আর মায়ার জন্য বর-খোঁজাখুঁজির কথা !

নিচে তোলপাড় পড়েছে ঃ মায়া ছিল যে এখানে ? বসে থাকতে বলা হয়েছে। অ্যাঁ, দেখ দিকি কাণ্ড ! এক-গা গয়না পরে যায় কোথায় মেয়ে ?

ছাত থেকে মায়া তাড়াতাড়ি নেমে এল। পিসিমা বলেন, গহনা খোল। এক একখানা করে খুলে এই থলিতে দে। বরকর্তা দেখবে, বরযাত্রীদের দেখাবে। রঘুর ছেলেকে দিয়ে বলে পাঠাল ওরা।

হেমন্ত তিক্তকণ্ঠে বলে, দেখবে ফাঁকিজুকি দিয়েছি কিনা আমরা। সোনার ওজন কম আছে কিনা, বেশি খাদ মেশানো কিনা। তাই যদি থাকে, কি করবি তোরা ? বর তুলে নিয়ে যাবি আসর থেকে ? দেখ না তাই চেষ্টা করে—ঘাড়ে ক'টা করে মাথা এনেছিস দেখা যাক। বাবাকে বলেও ছিলাম, বুঝলে পিসিমা—গয়না কনের গায়ে পরানো হয়ে গেছে, এখন আর খোলা যাবে না। তা বাবার যা গতিক—মেয়ের বিয়ে দিতে বসে যেন খুন-ডাকাতি-রাহাজানি করে বসে আছেন। বললেন, দাও দেখিয়ে ওঁদের সমস্ত। কোন রকম কারসাজি যখন নেই, ভয় কিসের ? বরকর্তার ভয় করেই যেন ঠিকঠাক জিনিষপত্র দেওয়া হয়েছে ! মায়ারাণী বাড়ির মেয়ে নয় যেন, আমাদের বোন নয় !

গলা একটু যেন ধরে আসে গোঁয়ারগোবিন্দ বড়ভাইয়ের। বলে, দু-হাতে দুটো কাচের চুড়ি পরে নে মায়া, কী করবি ! ভোগান্তি সেই

কনে-দেখার দিন থেকে চলেছে। যা বলছে করে যা—যতক্ষণ না আমার মাথা খারাপ হচ্ছে, মুচড়ে মুণ্ড ছিঁড়ে না নিচ্ছি যতক্ষণ।

থলিতে গয়না ভরে মুখে একটা গেরো দিয়ে হেমন্ত চলে গেল। পিসিমা বলেন, রঘুর ছেলে খবর নিয়ে এসেছে। হায় আমার কপাল! যত গয়নাগাঁটি তার বাড়িতেই তো যেত! আংটি বোতাম বরসজ্জার খাট-চৌকি পিতলকাঁসা সমস্ত তার। গাঁয়ের মেয়েটা দিব্যি গাঁয়ের উপর থাকত—জিনিষপত্তোর নিয়ে এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি গিয়ে ওঠা। কত চেষ্টাচরিত্র হল—তা লেখাপড়া করছেন যে উনি, লেখাপড়ার মধ্যে কী করে বিয়ে হয়! বউ যেন বই-কলম কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিত উনুনে!

মায়ারাণী বিয়ের কনে—সবাই সব বলবে, তার আজকে মুখ বন্ধ। তবু কিন্তু থাকতে পারে না। পিসিমাকে দেখিয়ে দেয়ঃ চুপ কর পিসিমা। ঐ দেখ না, সেজদা দাঁড়িয়ে আছে। শুনতে পাবে।

তাকিয়ে দেখে পিসিমার গলার স্বর খাদে নেমে এল। একেবারে ফিসফিসানি। তবু বলেই চলেছেন, শুনলে তো বয়েই গেল! আমাদের রোজগেরে পাত্তোর—অনেক ভাল পাত্তোর ওর চেয়ে। এক একটা হাটের দিন সিকি-দুয়ানি-টাকায় হাতবাক্স ভরে যায়। রঘুর ছেলে পাশ-টাশ করে কবে লাটবেলাট হবে—গাছে কাঁঠাল হাতে তেল মেখে হা-পিত্যেশ বসে থাক এখন।

বিয়ের পরদিন বাসি-বিয়ে। বাসি-বিয়ে তো বাঁশির বিয়ে। গেল কোথায় রে শানাই—চিঁড়ে-মুড়কি খাচ্ছে বুঝি? যদ্দূর খেয়েছিস, থাক এখন ঐ অবধি। বাজনাবাদ্যি না হলে বিয়েবাড়ির ঘুম ভাঙে না। লোকে ভাববে, বর-কনে বিদায় হয়ে গেছে। বাজা, বাজা—

দুপুরবেলা বাসি-বিয়ের ভোজ। বরযাত্রীরা কাল খেয়েছেন বর-পক্ষের নিমন্ত্রণে। বরকর্তা আদর-যত্ন করে নিয়ে এলেন, কুটুম্ববাড়ি এক সাঁজে, ভাত নয়—লুচির ফলার করলেন। আজকের আলাদা

ব্যাপার। কন্যাকর্তা নিমন্ত্রণ করবেন জনে জনের কাছে গিয়ে। নয়তো পাতের কাছে কাউকে আনা যাবে না।

হাতজোড় করে হীরালাল সকলের কাছে ঘুরছেন: আমার নিবেদন, দয়া করে আপনারা আমার বাড়ি আজ মধ্যাহ্নে মাধ্যাহ্নিক-ক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। যৎসামান্য শাকান্নের আয়োজন হয়েছে।

মাথায় টাক দীর্ঘকায় মানুষটি বিষম জোরে হুঁকো টানছেন। কে কখন কলকের দাবিদার হয়ে আসে—তার আগেই তামাক পুড়িয়ে ছাই করবেন, এই সঙ্কল্প। হাত তুলে হীরালালকে দাঁড়াতে বলেন তিনি। আরও কতকগুলো মোক্ষম টান দিয়ে হুঁকো থেকে মুখ তুলে জড়িতকণ্ঠে বলেন, কি জাত মশায়রা ?

হীরালাল অবাক হয়ে আছেন দেখে বললেন, দাস উপাধি কিনা মশায়ের! বদ্যি, কায়েত থেকে আরম্ভ করে অনেকেই তো দাস।

হীরালাল বলেন, আপনাদের ছেলের বিয়ে দিলেন কাল আমার মেয়ের সঙ্গে—

বিয়েথাওয়া সত্ত্বেও কত রকম খুঁত বেরিয়ে পড়ে। সেকালের বাঘা-বাঘা ঘটক মশায়রা নেই তো, পাঁতি খুলে যাঁরা সঙ্গে সঙ্গে জাত বের করে দিতেন। কোন গোত্র মশায়ের, কার সন্তান? আমার নাম শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ। নাম শুনেছেন ?

কস্মিনকালে শোনেন নি হীরালাল। কিন্তু কন্যার পিতা বলে চুপ করে থাকতে হয়। বিপিন ঘোষ বললেন, বাঘুটের ঘোষ আমরা—মুখ্য কুলীন। কুলীন-সম্মান পাঁচটি টাকা লাগবে। ভোজের আগে নগদ আবশ্যক।

হীরালাল সকাতরে বলেন, মেয়ে পাত্রস্থ করা কতবড় সঙ্কট, বুঝতে পারছেন। ঈশ্বর-দত্ত সম্মান আপনার ঘোষজা মশায়। গরিবকে অনুগ্রহ করুন। সম্মান তাতে বাড়বে বই কমবে না।

কথাবার্তার মধ্যে দু-চার জন জুটে গিয়েছে হীরালালের পিছনে। প্রফুল্ল রাগ করে বলেন, অত কান্নাকাটির কি হল কাকা? কুলীন-বিদায় উঠে গেছে আজকাল। খুব তো কুলের আঁটি ধরে আছেন মশায়। কুলীনের নবলক্ষণ—মুখে মুখে শুধু সেইগুলো বলুন দেখি। তা হলেও বুঝব।

অর্বাচীন অপোগণ্ডের দিক থেকে অবহেলায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বিপিন ঘোষ পুনশ্চ হুঁকোয় মুখ দিলেন।

হীরালাল বলেন, কুলীন এসেছেন মোট সাতাশটি। অনিল বাবাজী ফর্দ দিলেন। বুঝে দেখুন ঘোষজা মশায়, অত কুলীনের সম্মান-খরচায় তো আর একটা মেয়ের বিয়ের ভোজ হয়ে যায়।

বিপিন ঘোষ ঘাড় নেড়ে বলেন, কিছু না, কিছু না। কুলীন কুলীন—সবাই কপচে বেড়ায়। মুখ্য কুলীন সারা বঙ্গদেশ কুড়িয়ে যে ক'জন আছে, আঙুলে গণা যায়। মধ্যাংশ কিছু আছে। আর যত দেখেন সবাই তেজো-দোজো। একটা পিঁপড়ে মুখে করে যতটুকু চিনি নিতে পারে, সেই কণিকাপ্রমাণ তাদের কুল। আমার সঙ্গে অন্যের তুলনা—ঘোড়া-ভেড়ার এক দর! বলুন না মশায়। আর মশায়ের বাড়ি উপস্থিত ঐ সাতাশ কুলীনের মধ্যে কত জনে কুল ভেঙে বংশজ হয়ে আছে, তারও হিসাব নিয়ে দেখুনগে।

সহসা হেমন্তর আবির্ভাব। সে নিরুদ্বেগ একেবারে। বলে, ভোজ হবে দুপুরবেলা, এসব সেই সময়ের কথা। এতই হচ্ছে, আর কুলীনেরা ন্যায্য সম্মান পাবেন না কেন? কোন চিন্তা নেই মশায়। খাওয়ার আগে সম্মান চান তাই পাবেন, পরে চান তো পরে। ওদিকে মুশকিল হয়েছে—বর-কনের বিছানা তুলছে না মেয়েরা, শয্যাউত্থানের টাকা চাচ্ছে। ইস্কুল লাইব্রেরি হরিবাড়ি আর দরিদ্র-আশ্রম থেকেও বসে আছে টাকার জন্য। অনিল বাবু সময় বুঝে কোনদিকে সরে পড়লেন।

বিপিন ঘোষের দিকে চেয়ে বলে, আপনি তো বরপক্ষের এক মুরুব্বি মশায়। আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিন না।

বিপিন ঘোষ শুনতে পেলেন না। তামাক খাচ্ছেন, নাকে-মুখে ধোঁয়া ছেড়ে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে গেছেন।

বাসি-বিয়েয় পুরুত লাগে না, স্ত্রী-আচার সমস্ত। বর-কনে কলা-তলায় স্নান করবে। আংটি দিয়ে বর সিঁতুর পরাবে কনের সিঁথিতে। বরণ করবে যত বউ-মেয়েরা। ঘরে নিয়ে বসিয়ে যৌতুক খেলাবে। আমোদের ব্যাপার আগাগোড়া—হাসিঠাট্টা রংতামাশা। স্নানের সময় বর আর কনের পিঠে পুতুল গড়তে হয়। পিঠালির পুতুল, কনের পিঠে বর গড়ছে, বরের পিঠে কনে। গড়ছে কি তারা আর—অন্য মেয়েরা করে দিচ্ছে, ওরা হাত ঠেকিয়ে যাচ্ছে এই মাত্র। কনের পিঠে ছেলে-পুতুল, বরের পিঠে মেয়ে-পুতুল। অর্থাৎ বর চাচ্ছে ছেলে হোক বউয়ের, বউ চাচ্ছে মেয়ে।

ঘরে নিয়ে যাবার আগে বরণ। বাজনদারের যত রকম বিদ্যে জানা আছে, দেখাবে এই সময়। কাজকর্মে আটকা পড়ে পাড়ার মেয়ে-বউ এখনো যা দু-একটা বাড়িঘরে আছে তারা বলবে, ঐ রে—বরণের বাজনা বেজে উঠল। চল, চল—

পান-বরণ। দু-হাতে দুটো পান প্রদীপে সেঁকে তপ্ত করে নিয়েছে। সম্পর্কে বরের বড় শালী হয়—ছায়ারাণী করছে বরণটা। দু-হাত কাঁপিয়ে নিচু থেকে পান তুলতে তুলতে শেষটা বরের মুখে দিয়ে দেবে। হাঁ করেছে বর—করল কি, পান না দিয়ে বুড়ো আঙুলের ঠোনা মারল গালের দু-পাশে।

কলা-বরণ। দু-হাতে দুই কাঁঠালিকলা। এবারে তো আরও সাংঘাতিক। কলা দিয়েই ঠোনা মারবে, না মুখের ভিতর কলা ঢুকিয়ে দেবে—কে জানে! বর দুঃসাহসিক কাজ করল, খপ করে কলাসুদ্ধ দু-হাত ধরে ফেলল ছায়ারাণীর। দোকানদার মানুষ, বড় বড় বস্তা সরাচ্ছে

ঘোরাচ্ছে অহরহ—ছায়ার নরম হাত দুটো অবহেলায় উলটে ধরে তার নিজের মুখেই ঠোনা মারছে কলা দিয়ে। কেমন দিদি, হল তো?

আচ্ছা জব্দ! মেয়েরা হেসে এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে।

দূর্বা-বরণ। বড় শক্ত বরণ, যার তার কাজ নয়। বড়বউ করছে এবারে। ধান আর দূর্বা দু-হাতে—শুধুমাত্র হাত দুটো নয়, সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে এই বরণ করে। কড়া রোদ। ঢোল-কাঁসি মেতে গিয়ে বাজছে বরণের তালে তালে। বড়বউয়ের ফর্শা মুখ টকটকে রাঙা হয়ে গেছে। চোখের ভাব কেমনতরো। অচেতন হয়ে পড়বে নাকি? না, সামলে নিয়েছে। এমন উৎকৃষ্ট বরণ—তার মধ্যেও বজ্জাতি। দোকানদার বরকে ঘাঁটাতে আর সাহস হয় না, মস্করা একটু মায়ারাণীকে নিয়ে। দূর্বার গোড়ায় কাদা—হাত কাঁপাতে কাঁপাতে কপালে দূর্বা ছুঁইয়ে যাচ্ছে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে, কাদার পোঁচ লেগে যাচ্ছে কপালের উপর। ওমা, কাঁদছে যে মায়ারাণী—দু-চোখ জলে ভরা। ও আমার ননীবালা রে! বড়বউ মনে মনে বলে, দূর্বার ছোঁয়া সইতে পার না—যাচ্ছ তো শ্বশুরবাড়ি, তেমন তেমন বউ-কাঁটকি শাশুড়ির পাল্লায় পড় তো বুঝবে তখন ঠেলা!

বাড়ির নিচে খাল। কোটালের জোয়ারে খাল ভরভরতি এখন। বটতলার ঘাট থেকে নৌকা খালের ঘাটে এনে ফেলেছে। বর-কনের জন্য পালকির হাঙ্গামা করতে হবে না আর, বাড়ি থেকে সোজা গিয়ে নৌকায় উঠবে।

হেমন্ত হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে, বরযাত্রী মশায়দের হয়ে গেল? ওঁদের বড়-পানসি এক্ষুনি ছেড়ে দেবে বলছে। খালের জল কমে গেলে পানসি আর নড়ানো যাবে না। বর-কনে আলাদা ছোট-ডিঙিতে। তাদের বরঞ্চ একটু দেরি হলে দোষ হবে না।

সামিয়ানার নিচে বরযাত্রী অনেকেই বসে গেছেন ইতিমধ্যে। বলাবলি হচ্ছেঃ শুনলে তো, হাত চালিয়ে নাও। ভাঁটা হয়ে

গেলে রাতদুপুর অবধি খালের মুখে আটক থাকতে হবে। শীতের রাত—লেপতোষক দিয়ে কালকের মতন কেউ খাতির করবে না।

কেবল বিপিন ঘোষ এবং আর কয়েকটি কুলীন-সন্তান বেজার মুখে ঘোরাঘুরি করছেন।

হেমন্ত বলে, আপনারা বসলেন না?

তোমারই যে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তখন চাপা দিয়ে দিলে, কথাবার্তার কিছু তো আস্কারা হল না।

হেমন্ত বিরক্তকণ্ঠে বলে, পানসি ছেড়ে দেয় ওদিকে। সম্মানটা খাওয়ার পরে নিলেও তো হত। ও, বিশ্বাস হয় না বুঝি—আগাম নিতে চান?

পচা কোথায় ছিল, তড়াক করে এসে পড়ল। বলে, ঘাবড়াও কেন হেমন্ত-দা? সম্মান আগামই দেওয়া হচ্ছে। কতর পর্যায় বলুন ঘোষজা মশায়। প্রফুল্ল-দা, আপনি বরঞ্চ মোটা দেখে একখানা জিওলের কচা ভেঙে আনুন।

তখন হেমন্ত আর পচায় তুমুল ঝগড়া: এই পচা, গোঁয়াতুর্মির জায়গা নয় এটা। বাড়িটা আমাদের, সেটা খেয়াল রাখবি।

পচা বলে, কিন্তু সম্মান হাতে-হাতে না পেলে যে বসতে চাচ্ছেন না। পানসি ওদিকে ছেড়ে দেয়।

হেমন্ত আরও উত্তেজিত হয়ে বলছে, রাহা-বাড়ি যা করেছিলি, এখানে সে ব্যাপার চলবে না। কুটুম্ব আমাদের, হুঁশ থাকে যেন।

ভোজ খেতে খেতে একজনে বলে, হুঁ, শুনেছি বটে কী এক গণ্ডগোলের কথা। রাহা-বাড়ি কি হয়েছিল বলুন তো?

প্রফুল্ল বলেন, কুলীনরা সম্মানের জন্য বেঁকে বসলেন। ডেকে ডেকে তখন জিজ্ঞাসা করে, কতর পর্যায় আপনি? বলছে পঁচিশ—গণে গণে পঁচিশ ঘা অমনি পিঠে। বলল ছাব্বিশ—। গণে গণে ছাব্বিশ ঘা।

দাঁতে দাঁতে ঘষে হেমন্ত বলে, করেছিল এই পচাই দলবল

জুটিয়ে এনে। গাঁয়ের বদনাম। আজ যদি তেমনি কিছু করতে যাস, খুনোখুনি বেধে যাবে কিন্তু।

উঠানে জায়গা করা আছে সকলের জন্য। বিপিন ঘোষ বাদে অপরাপর কুলীন-সন্তানরা টপাটপ বসে পড়লেন।

পচা হেসে বলে, হল কি মশায়দের? সম্মান না নিয়েই বসে গেলেন?

তেজো-দোজো কুলীন আমরা। পিঁপড়ের মুখে যা ধরে, সেইটুকু মাত্র কুল। সম্মানও সেই অনুপাতে হবে তো! ঘোষজা মশায় মুখ্য কুলীন—কুলপতি। ওঁকে যথাযোগ্য সম্মান দিন, তাতেই সকলের হয়ে যাবে।

একটা মাত্র জায়গা খালি তখন—বিপিন দ্বিরুক্তি না করে বসে পড়লেন। হেমন্ত হি-হি করে হাসতে লাগল: খবর নিয়েছি ঘোষজা মশায়, সম্পর্কে আপনি অনিল বাবুর ভগ্নিপতি হন। ঠাট্টার সুবাদ, তাই ঠাট্টাতামাশা করা গেল একটু। কিছু মনে করবেন না।

এসব তো হল, কিন্তু মায়ারাণী গেল কোথায়? এই ছিল, এই নেই। পুরুতঠাকুর যাত্রামঙ্গল পড়াবার জন্য এসেছেন। বরের সাজগোজ হয়ে গেছে। মেয়ের সাজে বেশিক্ষণ লাগে, তারই কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। এই তাড়ার সময়টা হাঁদা মেয়ে কোথায় গিয়ে যে রইল!

কে-একজন বলে, খিড়কির বাগানে যেতে দেখেছে মায়ারাণীকে। আম-কাঁঠাল-নারকেল-সুপারির মস্ত বড় বাগিচা, মাঝখানে পুকুর। পুকুরপাড়ে পিসিমা গিয়ে দেখেন, নতুন বিয়ের কনে তুমুল ঝগড়া লাগিয়েছে রঘুর ছেলের সঙ্গে। কোথাও কিছু নয়, মায়ারাণী নাকি পিছন দিক দিয়ে এসে আচমকা কাদা ছুঁড়ে মেরেছে। গজরাচ্ছে এখনো মেয়ে: বেশ করেছি! বড়দি বলল, মুখ-হাত-পা ধুয়ে আয়—ভাল করে সাজাব। তাই পিসিমা, সাবান-গামছা নিয়ে

পুকুর-ঘাটে নেমেছি। সেজদা তখন নারকেলগাছের আড়াল থেকে দেখছে লুকিয়ে লুকিয়ে।

মিথ্যে কথা পিসিমা। আমি কিছু জানি নে, এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম ওখানটা। সাবান-গামছা কোথায়, দেখাতে বলুন তো। সমস্ত ওর বানানো।

চলে যাবার ঠিক পূর্বক্ষণে এখন বকাবকির সময় নয়। মেয়ের হাত ধরে টেনে পিসিমা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। যাবে কি সহজে! ঝগড়া করছে মুখ ফিরিয়েঃ কাদা ছুঁড়েছি, বেশ করেছি। ইট ছুঁড়তাম হাতের কাছে পেলে। কেন সেজদা আমার দিকে তাকাবে? ভোজে বসে সবাই খাচ্ছেদাচ্ছে, কেন অমন জঙ্গলের মধ্যে একা-একা লুকিয়ে থাকবে?

ডিঙায় উঠল বর-কনে। ঢোল-কাঁশি বাজে, শানাই বাজে। হঠাৎ ঢুলি ঢোল থামিয়ে শানায়ের সুর গানের কথায় বলে যাচ্ছেঃ

কাঁদিস নে রাই বিনোদিনী,
বনে কাঁদে তোর নীলমণি রে—
ও রাই, কাঁদিস নে।

শানাই বাজে, শুনতে পাচ্ছ সাদেক আলি?

সাদেক আলি এদিক-ওদিক তাকায়। জঙ্গল। শিয়াল ঘুরে বেড়ায় দিন দুপুরে—দু-দুটো মানুষ আমরা, তা বলে গ্রাহ্য নেই। কাঠঠোকরা অদূরের কোন গাছে ঠোঁট হানছে। কোন এককালের খিড়কি-বাগানের সুঁড়িপথে হাঁটতে হাঁটতে আমি ইতিমধ্যে বিস্তর দূরে গিয়ে পড়েছিলাম—অনেক বছরের পিছনে। মাইনর-ইস্কুলের ভালমানুষ হেডমাস্টার সাদেক আলি এত ব্যাপার বুঝবে কি করে! অবাক হয়ে আছে সে আমার মুখে চেয়েঃ বল কি! বিয়েবাড়ি কোথায় দেখ কসাড়জঙ্গলের ভিতর, শানাই শোন কোথা?

এমনি সময় কাশির আওয়াজ। ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে যাক, মানুষ আছে তবে তো! একটা শুকনো নারকেল-পাতা টেনে কাশতে-কাশতে যেন জঙ্গল ফুঁড়ে উদয় হলেন—দৌড় দেব নাকি? সাদেক আলি সঙ্গে না থাকলে ঠিক তাই করতাম—নারকেল-পাতা হাতে আসছেন পিসিমাই বটে! সেকালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ দৈবসুন্দরী দাসী। দু-চোখের দৃষ্টি তাক করেছেন আমার দিকে। রক্ষে পেলাম, চোখে ভাল দেখেন না তবে!

কে তুমি? রঘুর ছেলের মতন লাগে—

তটস্থ হয়ে বলি, আমি নতুন লোক।

তা-ও তো বটে! রঘুর ছেলে কি করতে আসবে? মস্ত-লোক হয়েছে এখন, শুনতে পাই।

সাদেক আলি পরিচয় দেয়ঃ হাটখোলায় যে নতুন মাইনর-ইস্কুল হয়েছে, আমি তার হেডমাস্টার। ইনি কাল বিকালে এসেছেন, আমার বাসায় উঠেছেন, দু-জনে একসঙ্গে রয়েছি। ইস্কুলের বিল্ডিং হবে। শুনেছি পুরানো ইট বিক্রি আছে আপনার এখানে, বেড়াতে বেড়াতে তাই এলাম।

কিন্তু আরও বিপদ। বিধবা একজন—রোগা কাঠির মতন, ঝুঁটি করে চুলবাঁধা—পুকুরঘাট থেকে উঠে এল। হাতে ঝকমকে পিতলের বোগনো, পিতলের ঘটি, হাতা-বেড়ি। মাজা বাসন নিয়ে আসছে—পথের উপর কত রকম নোংরা আর এঁটোকাঁটা—এক পা হাঁটে, কী দেখে থমকে যায়, ডাইনে অথবা বাঁ-দিকে পাশ কাটিয়ে আবার এগোয়।

পিসিমা করকর করে ওঠেনঃ কাল তোর একাদশী গেছে। সাত সকালে বাসন মাজতে ঘাটে গিয়ে বসলি?

কি বলছিলে পিসিমা এঁদের সঙ্গে?

দেখ্ দিকি, মানুষটা যেন রঘুর ছেলের মতন। বলছে, সে নয়। এরা পুরানো ইটের খোঁজে এসেছে।

মায়ারাণীও তাকিয়ে দেখে বলে, ক্ষেপেছ পিসিমা? সেজদা এখন কত বড়লোক, কত নামকাম করেছে, পোড়া গাঁয়ে সে মরতে আসবে কি জন্য!

পিসিমা তখন বলেন, চলে যাচ্ছ—ইটের কথা হল না যে বাবা? সস্তা করে দেব—দশ টাকা করে হাজার। লোকজন লাগিয়ে ভেঙেচুরে নিয়ে যাও।

সাদেক আলির হাত ধরে টানি: চল, বড্ড বেলা হয়ে গেছে।

পিছু পিছু দৈব-পিসিমা আসছেন: কি হল বাবা? দশ নয় পাঁচ। আচ্ছা, তিন—

কী যেন বলছে মায়ারাণী পিসিমার কানের কাছে মুখ নিয়ে।

নিয়ে যাও বাবা। তিন টাকা করে হাজার। বাড়ির সবাই হিন্দুস্থানে উঠে গিয়ে মজায় আছে। ভিটেয় পিদদিম দেবার জন্য আমায় রেখে গেল। আর আজ তিনমাস কড়ে-রাঁড়ি মায়া পোড়ারমুখি শ্বশুর-শাশুড়ি গিলে খেয়ে রাজ্যসুখ করতে এসে উঠেছে। বছরের ধান আছে, ফলকরা বেচে কোন রকমে হাটবাজারটা চলে। তা পোড়া গাছে ফলন একেবারে নেই। যে দাম পছন্দ কর, তাই দিয়ে তোমরা বাবা ইট নিয়ে যাও।

সাদেক আলি বলে, নোনা ধরে গিয়ে ইটের কিছু নেই। ওতে কাজ হবে না।

পিসিমা পিছন থেকে চেঁচাচ্ছেন: তবে মাংনাই নিয়ে যাও। ইট সরে গিয়ে জঙ্গল সাফসাফাই হলে সাপের বাতান উঠে যাবে। আমার মায়ারাণীর তক্তাপোশের নিচে সেদিন একটা কেউটেসাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিল। ইস্কুলে দশজনের ছেলে পড়বে, ইট তোমাদের এমনি দিয়ে দিচ্ছি।

দশটা টাকা বের করে সাদেক আলিকে বলি, দিয়ে এস পিসিমাকে। বল, বায়না স্বরূপ দিয়ে যাচ্ছি। টাকা দিয়ে পালিয়ে এস। ছুটে পালাও বিয়েবাড়ি থেকে।

কিন্তু তা-ও চলবে না। টাকা হিন্দুস্থানের—টাকা নিয়ে ওঁরা নানান ঝামেলায় পড়বেন। আমাকেও বর্ডারে তল্লাস করে লিখে রেখেছে, কত টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সেই টাকা ঠিকঠাক দেখাতে হবে ফেরার সময়।

নোটখানা আবার নিয়ে পকেটে পুরলাম।

মায়াকন্যা

হরিপ্রসন্ন আমার বাল্যবন্ধু। দায়ে পড়ে তার চাকরি নিয়েছি। তবে সে লোক ভাল। আমি কর্মচারী, সে মনিব—বাইরের লোক আপনারা কোনক্রমে বুঝতে পারবেন না। যেন বন্ধুই আমি, খাতিরে তার কাজকর্ম করে দিই। মাসান্তে হঠাৎ একদিন খানকয়েক নোট আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে চট করে সরে পড়ে। এই হল মাইনে দেওয়ার প্রক্রিয়া।

সুন্দরবন অঞ্চলে হরিপ্রসন্নর অনেকগুলো চক। নতুন আইন পাশ হল, এবারে জমিদারি গুটিয়ে নেবার পালা। কতক জমি বিক্রি করে, কতক বা বেনামি করে, আর কতকটা জায়গায় বাগান-পুকুর ইত্যাদি বানিয়ে তড়িঘড়ি যতদূর বের করে নেওয়া যায়। এরই তোড়জোড়ে আজকাল বাদাবনে তার ঘন-ঘন যাতায়াত।

একবার আমায় বলল, যাবি?

অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নয়, যেতেই হবে। রুবিকে নিয়ে মুশকিল—কার কাছে রেখে যাই? দুর্ভাগা মেয়ে, ছ-মাস বয়সে মা হারিয়েছে, আমিই মা-বাপ দুই হয়ে দেখাশুনো করি। খুড়িমা সম্পর্কের একজনকে অনেক বলেকয়ে এবং নগদ কুড়ি টাকা হাতে দিয়ে দশ দিনের কড়ারে মেয়েটাকে গছিয়ে রওনা হলাম।

বৈশাখ মাস। যা গরম পড়েছে—গাঙে খালে কয়েকটা দিন তোফা হাওয়া খেয়ে বেড়ানো যাচ্ছে। এটা উপরি লাভ। সুন্দরবন শুনে ভাববেন না বনজঙ্গলই শুধু। জঙ্গল তো বটেই—হঠাৎ তার মধ্যে দেখবেন, পঙ্খের কাজ করা প্রায়-অভগ্ন পাকা কুঠুরি—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কোন অনুচর বানিয়েছিল। হয়তো রয়্যাল-বেঙ্গল-টাইগার ইদানীং মহানন্দে বিনা-ভাড়ায় তথায় সগোষ্ঠী বসতি করছে। কখনো বা নজরে পড়বে অনেকটা ফাঁকা জায়গা—হাসিল হয়ে সেখানটা আবাদ হচ্ছে। কিংবা নদী-খালের ধারে দেখতে পাবেন ছোটখাটো দিব্যি একটা গ্রাম। কাছাকাছি বনকর-অফিস, তাকে ঘিরে মানুষ ঘরবাড়ি তুলেছে। অথবা গ্রামের মতন দেখেই সবকারি অফিস বসিয়েছে সেই জায়গায়। নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন না—স্বচক্ষে দেখে আসুন, কতটুকুই বা পথ আপনাদের জায়গা থেকে !

প্রথম আমরা শিবনগর কাছারিবাড়ি উঠলাম। নায়েবের সঙ্গে সেহা-কড়চা রোকড়-খতিয়ান নিয়ে বিষম আয়োজনে হিসাবপত্তর চলছে। কিন্তু জানি তো হরিপ্রসন্নকে ! ছটফটে স্বভাবের মানুষ—দিন চারেক পরে বিরাট কড়চা-খাতা হঠাৎ সশব্দে বন্ধ করে বলল, এদিকে ভালই হচ্ছে নায়েবমশায়, হাঁসখালি-চকের কী গতিক একবার দেখে আসা দরকার। ভাতে-ভাত চাপিয়ে দিতে বলুন—এই ভাঁটায় বেরিয়ে পড়ব।

এই হাঁসখালি যাওয়ার পথেই কাণ্ডটা ঘটল। কুক্ষণের যাত্রা—বাপ-ঠাকুর্দার পুণ্যে প্রাণে বেঁচে এসেছি। কিংবা বলব, পরম লগ্নে বেরিয়েছিলাম—ভাবতে আজও রোমাঞ্চ লাগে। বলছি, বলছি—অত তাড়াবেন না। বলবার জন্যে তো আসর সাজিয়ে বসলাম।

ত্বপুরবেলা আমাদের পানসি এক পাশখালি দিয়ে যাচ্ছে। গোটা ত্বই বাঁক পার হতে পারলে বড়-গাঙ। হরিপ্রসন্ন থামতে ইশারা করল মাঝিকে। হামেশাই জঙ্গলে আসে, ঝানু শিকারি—আমরা চতুর্দিকে

নিঝুম নিঃসাড় দেখছি, সে তার মধ্যে জন্তু-জানোয়ারের চলাচল টের পেয়েছে।

পানসি এক হেঁতাল-ঝোপের আড়ালে নিয়ে রাখল। পনর-বিশ মিনিট যায়, বন্দুকে টোটা ভরে হরিপ্রসন্ন জঙ্গলের দিকে তাক করে আছে। তার পরে দুড়ুম-দুড়ুম। হরিণ পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও লাফিয়ে পড়ে জঙ্গলে। এ রকম যাওয়া ঠিক নয়—কিন্তু স্ফূর্তিব চোটে বাদার নীতিনিয়ম ভুলে গেছে।

টানাটানি করে শিকার তো নৌকোয় তুলেছে—বাঁকের মুখে এমন সময় মোটরলঞ্চ। শিকারের লাইসেন্স নেওয়া নেই, তার উপরে মাদি-হরিণ পড়েছে—হেন অবস্থায় বনকরের লঞ্চের সামনে পড়া আর বাঘের মুখে পড়া একই কথা। হরিপ্রসন্ন তা বলে ঘাবড়ায় না। যেন ওদেরই প্রতীক্ষায় ছিল। সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল : বড্ড বাঁচিয়ে দিলেন মশায়রা। নয়তো নৌকো নিয়ে বেগোন ঠেলতে হত আপনাদের অফিস অবধি। ফিস্টি হবে—দাড়িওয়ালা সেই লোকটা আছে তো, সেই যে আহা-মরি মাংস রাঁধে? হরিণটা লঞ্চে তুলে দাও হে—

হরিণ তোলবার আগে নিজেই উঠে পড়েছে। আমাদের হাঁক দিয়ে বলে, বড়-গাঙে বেরিয়ে বিষখালির মোহানায় চাপান দিয়ে থাকগে। নিশ্বেস ফেল না, তোমাদেরও ফিস্টি—রাঁধা-মাংস নিয়ে আসব। শুধু উনুনে চাট্টি ভাত চাপিয়ে রেখ, ব্যস!

সে হল দুপুরবেলার কথা। এক পহর রাত হয়ে গেল, পেটেব ভিতর বাপান্ত করছে—না হরিপ্রসন্ন, না তার আহা-মরি মাংস। সারাদিন বড্ড ধকল গেছে, পাশখালিতে জল ছিল না—কাদায় নেমে তিন-চার মাইল নৌকো ঠেলেছি। মাঝিমাল্লারা সন্ধ্যে থেকে নাক ডাকাচ্ছে। একা বসে বসে আমিও কখন শুয়ে পড়েছি—একদম কিচ্ছু জানি নে।

পানসি হেলছে দুলছে—ঘুমের মধ্যে এক সময় টের পেলাম।

অর্থাৎ জোয়ার এসে গেছে। বাচ্চাকে দোলনায় চাপিয়ে মা যেমন দোলা দেন, ঠিক তেমনি। মন্দ লাগে না। খানিক এমনি গেল। ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্ন দেখছি—

হঠাৎ মাঝি চেঁচিয়ে ওঠে ঃ সর্বনাশ হয়েছে—নৌকো বানচাল!

লাফিয়ে উঠে বসে আতঙ্কে থরথর কাঁপি। জোয়ারের টানে কাছি ছিঁড়ে নৌকো তীরের মতন ছুটছে। নোনা জলের তরঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে সাদা দাঁত মেলে হাসছে খলখল শব্দে। যা অবস্থা, সবসুদ্ধ এতক্ষণ জলতলে যাই নি—সেই তো আশ্চর্য!

মাঝি হাল চেপে ধরে সামলাতে গেল তো মড়াৎ করে হাল দুই খণ্ড। চরম ক্ষণের অল্পই আর বাকি। হাত-পা কোলে করে সময়টুকু কাটিয়ে দাও—কোন-কিছুই করবার নেই। জলের কল্লোলধ্বনি আমার রুবির কান্নার মতন লাগছে। করাল অন্ধকারের পার থেকে রুবির কান্নাভরা ডাক শুনি যেন ঃ বাবা গো, ও বাবা—

ঘন অন্ধকারে কোন জায়গায় কী অবস্থার মধ্যে ছুটছি, বোঝবার জো নেই। পাগলা হাতির মতো মাথা নাড়তে নাড়তে নৌকো হঠাৎ গতি বন্ধ করে দাঁড়াল। পাড়ে লেগেছে, লতাপাতায় আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়ে কাছি বাঁধার মতো হয়েছে। এমন তো হয় না—বেঁচে গেলাম তবে নাকি? টেমি জ্বেলে চৌখুপি-লণ্ঠনের মধ্যে পুরে উঁচু করে ধরলাম। দুটো উদ্দেশ্য—কোথায় কি ভাবে আটকে আছি, তার কিছু হদিশ পাওয়া। আর জায়গাটা যদি গরম অর্থাৎ ব্যাঘ্রসঙ্কুল হয়, আলো ধরে জানোয়ারদের ভয় দেখানো।

মস্ত এক বাঁকের মাঝামাঝি কি গতিকে কিনারায় এসে পড়েছি। যে জোরে আসছিল, পাড়ে ধাক্কা খেয়ে পানসির কুচি-কুচি হয়ে যাবার কথা। কিন্তু বুনো-লতা জালের মতো আটকে ধরল। বিধাতাপুরুষ আমাদের বেমক্কা পরমায়ু দিয়েছেন, এই থেকে বোঝা যাচ্ছে।

গাঙের পাশাপাশি দীর্ঘ বিসর্পিল এক বস্তু—বাঁধ বলে তো মনে

হচ্ছে। আরে—মানুষ কথা বলছে। মানষেলায় এসে পড়েছি তবে তো!

স্ফূর্তিতে নেমে পড়লাম। বিস্তর গোলঝাড়—সেগুলো পার হয়েই বাঁধ। বড় বড় কেওড়াগাছ জায়গাটায় আঁধার জমিয়ে তুলেছে। বাঁধের ওধারটা একেবারে ফাঁকা। মেঠো-জমি ভেঙে হনহন করে কারা আসছে, গুনতিতে পনের-বিশ জন। বিলের মুক্ত বাতাসে ওদেরই কথাবার্তা কানে গিয়েছিল।

এসেই ধমক দিয়ে ওঠে আমার উপর: আচ্ছা মানুষ! আঘাটায় নেমে পড়ে লণ্ঠন দেখাচ্ছে। সন্ধ্যে থেকে আমরা হা-পিত্যেশ পথ তাকিয়ে আছি। এস, চলে এস—

কোথায়?

পালোয়ান গোছের একব্যক্তি হুঙ্কার দিয়ে উঠল: কোথায় যেন জানেন না! আকাশ থেকে পড়লেন।

আকাশ থেকে পড়ি নি, জোয়ারের টানে এসে পড়েছি। সত্যিই আমি কিছু জানি নে।

থাক, থাক। জাত-যাওয়া কাণ্ড—রাতদুপুরে উনি এখন রঙ্গরস শুরু করলেন।

হাত ধরল। উঃ, উঃ—হাড় যেন গুঁড়ো হয়ে যায়। লোকটা হাত ছেড়ে দিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বলে, ননীর পুতুল! গুটিগুটি অমন পা ফেললে হবে না, জোর কদমে চল। লগ্নের আর দেরি নেই।

পাকা-গোঁফ এক প্রবীণ মানুষ এগিয়ে এসে হাতের লাঠিটা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। ভাল মানুষ তিনি, কোমল কণ্ঠ। বললেন, তোমার লণ্ঠনটা আমার হাতে দাও দাদাভাই। অজানা পথ—লাঠি ধরে সাবধান হয়ে আমাদের সঙ্গে এস।

চোখ রগড়ে পরখ করি, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছি না তো?

সকাতরে বললাম, লগ্ন—কিসের লগ্ন ? বুঝতে পারছি নে, কেন যেতে হবে আপনাদের সঙ্গে।

হেসে উঠলেন সেই প্রবীণ মানুষটি ঃ ও রামনারাণ, শোন শোন—নাতজামাই কেন আমাদের সঙ্গে যাবে, বুঝতে পারছে না। ত্বনিয়ার এত মুলুক থাকতে শোলাদানায় কেন এসে পড়ে, তা-ও বোধ হয় জানে না।

হো-হো হা-হা বহু কণ্ঠে উচ্ছল হাসির ধ্বনি । একজন বলল, মশালগুলো ধরিয়ে ফেল হে ! ভূতপ্রেতের মতন গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে আছ, বর ভয় পেয়ে যাচ্ছে।

আমার সেই লণ্ঠন খুলে একে একে টেমিতে মশাল ধরিয়ে নিল। হু-হু করে হাওয়া দিচ্ছে, মশালের আলো কাঁপছে কালো কালো মূর্তিগুলোর উপর।

প্রবীণ লোকটি বললেন, আগে-পিছে মশাল ধর। মেঠো-পথ—হোঁচট না খায়। নাতজামাই হাঁটিয়ে নিয়ে বাড়ি তুলতে হচ্ছে। তোমারই দোষ দাদাভাই। ষোল বেহারার পালকি ঘাটে বসে আছে এখনো। খবরাখবর করে তাদের নিয়ে আসবার সময় নেই। উঃ, যা কষ্টটা দিয়েছ ! বসে বসে বিরক্ত হয়ে শেষটা ওরা বলল, গাঙের কিনারা ধরে এগিয়ে দেখা যাক। তাইতে তোমায় পেয়ে গেলাম।

মাঠে নেমে পড়েছি এখন। একবার একটু বলি, নৌকোর ওদের কিছু বলা হল না--

যা বলবার আমরা বলব। যেতে বলা হচ্ছে, তাই চল না তাড়াতাড়ি।

অধিক তর্ক করবার তাগত নেই। একটিবার হাত ধরেছিল, তার জ্বলুনি থামে নি এখনো। রহস্যময় লোকগুলো আমায় ঘিরে নিয়ে চলল। কোথাও খানাখন্দ, কোথাও আল-পথ, কোথাও বা ধান কেটে-নেওয়া জমির উপর দিয়ে চলেছি। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই—দম-দেওয়া এক কলের পুতুল হয়ে চলেছি।

অবশেষে পাড়ার মধ্যে এসে পড়লাম। তেমাথা পথের উপর তেঁতুলগাছ। অদূরে বাড়ির উঠানে সামিয়ানা খাটানো, বিস্তর লোকের আনাগোনা। অকুস্থলে পৌঁছে গেছি।

বর নিয়ে এসেছি—

অমনি ঢোল-কাঁসি-শানাই বেজে উঠল কোনদিক থেকে। উলু দিচ্ছে মেয়েরা, শাঁক বাজছে। মাঠের দিককার আকাশে শোঁ-শোঁ করে হাউই উঠে তারা কাটছে।

কন্যাপক্ষ অবস্থাপন্ন। বিয়ের আসর খাসা সাজিয়েছে। কাচের হাঁড়ি ঝোলানো সারি সারি, বাতি জ্বেলে দিয়েছে। রুপো-বাঁধান হুঁকোগুলো লোকের হাতে হাতে ঘুরছে—হুঁকোদানের উপর বড় একটা বসতে পায় না। গোলাপজল ছিটোচ্ছে ঘন ঘন।

পুরুত তৈরি হয়ে আছেন। উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি আর-এক দফা বকতে লাগলেন ঃ ছি-ছি, বড্ড ছেলেমানুষ! একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে তোমাদের! জাত মারবার জো করেছিলে। আর দেরি কোরো না, বরাসনে বসে পড়।

আত্মাভিমান হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। রুবির মুখ ভেসে উঠল মনের উপর। মৃত্যুপথযাত্রিণী রুবির মা'র সেই বাচ্চা মেয়েকে আমার কোলে তুলে দেওয়া।

মারুন, কাটুন,যা ইচ্ছে করুন—কিছুতে আমি আসনে বসছি নে। গায়ের জোরে বিয়ে দেবেন নাকি ?

এক-উঠোন লোকের মধ্যে কেউ চটে না। হাসে, যেন ভারি এক মজার ব্যাপার।

শোন, শোন—গায়ের জোরের বিয়ে নাকি! বর বলছে এই কথা।

আর একজন বলে উঠল, উপোস করে আছে। তার উপর এ-ঘাট ও-ঘাট করে মাথা বিগড়ে গেছে। আসনে বসিয়ে হাওয়া কর, ঠিক হয়ে যাবে।

সেই নিশিরাত্রে বনের প্রান্তে বাতির অনুজ্জ্বল আলোয় বিচিত্র জন-সমাবেশের মধ্যে আমি যেন আর এক মানুষ হয়ে যাচ্ছি। অতীত ধুয়ে মুছে প্রায় নিশ্চিহ্ন। শহরের পিচ-ঢালা রাস্তা, পাঁচতলা-সাততলা বাড়ি, সিনেমা-থিয়েটার, ট্রামগাড়ি-মোটরগাড়ি—সমস্ত বুঝি মনের আজগুবি কল্পনা ! স্বপ্ন দেখছিলাম নাকি এতক্ষণ—স্বপ্নের ঘোরে এক লহমায় যেন জীবনের তিরিশটা বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন বিষম হাসি পাচ্ছে কলকাতা শহর ইত্যাদি হাস্যকর অবাস্তব কতকগুলো জায়গার কথা মনে ভেবে।

শুভদৃষ্টি। চৌকির উপর দাঁড়িয়েছি টোপরে চাদর ঢাকা দিয়ে। পিঁড়ির উপর কনে বসিয়ে সাত পাক ঘোরাচ্ছে। চোখ নিচু হয়ে আছে আমার। চোখ মেলে বউ দেখব, এর চেয়ে বেহায়াপনা আর কী হতে পারে ! বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করছে। দেখন-সরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। সরার মধ্যে নানা রকম বাজির মশলা, জ্বালিয়ে দিলে চারদিকে যেন দিনমান হয়ে যায়। শুভদৃষ্টির সময় জ্বালে এইগুলো। সরা জ্বালিয়ে পাশ থেকে বলছে, চোখ মেল—চোখ মেল গো ! চার চোখের মিলন হবে, তবেই তো আমোদ-আহ্লাদে কাটবে সারাজীবন।

মুদিত পদ্মকলির মতন দু'টি ডাগর চোখ আমার দৃষ্টির সামনে। থরথর কাঁপছে চোখের পাতা—ভোররাত্রে পদ্মকলি এমনি করেই বুঝি পাঁপড়ি মেলে। সরার উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম, দুই চোখে দীঘির মতন কালো গভীরতা। জল উছলে পড়ল সেই দীঘি ছাপিয়ে চোখের প্রান্ত বেয়ে। কী তোমার মনোব্যথা ওগো কন্যা ? ইচ্ছে করে, আদর করে চোখ মুছিয়ে দিই। কিন্তু চারিদিকে এত মানুষ—লজ্জায় ঘাড় তুলতে পারি নে, তা হাত দিয়ে চোখ মোছাব !

বাসরঘরে এক শয্যায় আমরা দু'জনে। কত রাত্রি হয়েছে, বলতে পারব না। মাটির দেয়ালের কুলুঙ্গিতে পিলসুজের উপর প্রদীপ

জ্বলছে। মেয়ে-বউগুলো ঠাট্টাতামাশায় অনেক জ্বালাতন করেছে, জানলার বাইরে এখনো পাতান দিয়ে আছে কি না জানি নে। থাকে, থাকুক। ঠোঁটই নড়ছে আমাদের, ঠোঁট ঠোঁটে সামান্য ব্যবধান—কথাবার্তা কারো আর শুনতে হবে না।

মন্ত্র পড়ার সময় নামটা পেয়েছি—পদ্ম। সেই নিঃশব্দ কণ্ঠে বললাম, পদ্ম, তুমি কেঁদেছিলে তখন—

না তো।

তা হলে বলছ, কানা তোমার বর?

পদ্ম চুপ করে থাকে।

আমায় পছন্দ হয় নি বোধহয়?

পদ্ম বলল, অমন বললে আমার কত কষ্ট হয় জান! সকলে বলছিল, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি রাগ করতে লাগলে বিয়েয় কিছুতে বসবে না। আগে একবার নাকি বিয়ে হয়েছিল তোমার—একটা মেয়ে আছে। শুনে আমার ভয় করতে লাগল। আচ্ছা, ওসব কি সত্যি?

গোটা কলকাতা শহর যায় যাক স্বপ্ন হয়ে—কিন্তু আমার রুবি! বিষম সন্দেহের দোলায় দুলছি। গুটিসুটি হয়ে রুবি আমার কোলের মধ্যে ঘুমোয় আজ পাঁচ-পাঁচটা বছর। দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে ফিরতে একটু দেরি হলে। ও বাবা, তোমার বিছানা করে রেখেছি এই দেখ। ঐটুকু মেয়ের কাজ দেখলে তাজ্জব হয়ে যাবেন।....আর, এই এখানে বিয়ে হয়ে গেল খানিক আগে—পাশে নববধূ—উপোস করে ছিলাম এই বিয়ের জন্য—পথ ভুল করে দেরি হয়ে গেছে বিয়ে-বাড়ি পৌঁছতে, সেজন্য এরা খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিল—এতজনের কাছে শুনে শুনে মনে হচ্ছে, এটাই সত্য। যে-জীবন এতখানি বয়স ধরে কাটিয়ে এসেছি, সমস্ত কেমন ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। ভয় হচ্ছে, রুবিও শেষটা ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে না যায়।

এই দেখ, আবার তুমি মুখ অন্ধকার করলে। হাস—হাসতে

হয় গো আজকের দিনে। তোমার মুখে সব সময় যাতে হাসি থাকে, জীবন দিয়ে আমি তাই করব।

আমিও সেটা মনেপ্রাণে মেনে নিচ্ছি। দ্বিধা-সন্দেহ-ভয় অনেক ছিল, সমস্ত মুছে গেছে এইটুকু সময় পদ্মর সঙ্গে কাটিয়ে। বললাম, পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার—কাল বোধহয় বাসিবিয়ে-টিয়ে—কাল আর যাওয়া হচ্ছে না, যাব আমরা পরশু সকালবেলা। গিয়েই তুমি রুবিকে কোলে তুলে নিও সকলের আগে। রুবির মা হোয়ো। আমার মেয়ে যদি হাসে—দেখো, কত হাসি হাসব তখন আমি।

পদ্ম বলল, এরা যদি যেতে না দেয় ?

সে কি !

ধর, যদি ঘরজামায়ের মতো এখানে থাকতে হয় চিবকাল। কোন কিছুর অভাব-অনটন রইল না। তুমি মনিব হলে, কর্তা হলে—আমি তো দাসীবাঁদী আছিই, সকলে তোমার হুকুমবরদার হয়ে কাজকর্ম করবে।

না না, রুবি তবে ভেসে যাবে নাকি ?

শুয়ে ছিল পদ্ম, উঠে বসল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে রুবির কথা। খানিকক্ষণ তাবপর গুম হয়ে থেকে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল।

সামনে রোয়াক। রোয়াক পার হয়ে কোন দিকে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। চাঁদ উঠেছে, খোলা দরজায় এক ফালি জ্যোৎস্না ঘরের মধ্যে এসে পড়ল। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে, দিনমানের মতো পরিষ্কার।

পদ্ম ফিরে এল একআঁচল স্বর্ণচাঁপা নিয়ে। সুগন্ধে ঘর ভরে গেছে। বলে, নিচু ডালে অনেক ফুটে ছিল। তোমার জন্যে তুলে নিয়ে এলাম। নাও।

দু-হাত পেতে নিলাম। অঞ্জলি ভরে গেল। ফোঁস করে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল পদ্ম। আমার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। বললাম, তুমি বড় ভাল পদ্ম—তোমার জন্য সমস্ত ছাড়তে পাবি।

কেবল সেই আমার মা-হারা মেয়ে—কেউ নেই তাকে দেখাশুনো করবার। পাঁচ দুয়োরে ঠেলা খেয়ে মরবে। আসবার সময় দু-হাতে আমায় জড়িয়ে ধরেছিল, হাত ছাড়িয়ে দিয়ে চলে এলাম।

আবার বলি, রাগ করলে পদ্ম ?

জবাব দিতে গিয়ে পদ্মর কথা ফোটে না। জ্যোৎস্নার আলোয় মুখখানা উঁচু করে তুলে ধরি। বললাম, কী ভাবছ তুমি বল—

চল, কথা বলতে বলতে যাই।

কোথায় ?

এস না। এদের কথায় এদ্দূর আসতে পারলে, আমার কথায় যাবে না কেন ?

বিয়েবাড়ি এখন শান্তিতে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে, একটি মানুষ জেগে নেই। তেমাথাব তেঁতুলগাছ ছাড়িয়ে দুই চোর আমরা টিপিটিপি চলেছি। আরও খানিক এগিয়ে পদ্মর এবার গলা ফুটল। আহা, গানের সুরও এমন মিঠা হয় না। বলে, রুবির কথা ভাবছি। মা না থাকার কষ্ট আমি জানি। আমারও মা নেই—ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরে মারা গেলেন। তখন আমি একেবারে ছোট, ঝাপসা-ঝাপসা মনে পড়ে। বাবা আর গাঁয়ের মানুষরা ঘুরতে ঘুরতে শেষটা এই দক্ষিণ দেশে ধান-চালের আবাদে এসে নতুন করে ঘরবাড়ি তুললেন।

আমি বললাম, ছিয়াত্তুরে নয়—পঞ্চাশের মন্বন্তর। তোমার ভুল হচ্ছে।

এই তো সেদিনের কথা—ভুল হবার কী আছে! পলাশিতে সিরাজদ্দৌলার নবাবি গেল, তার কিছু পরেই তো!

পদ্ম পাগল নাকি তবে ? এতক্ষণের এত কথাবার্তায় টের পাই নি। চলার ধরনেও মনে হচ্ছে পাগল বটে! হাত ধরে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে আমায়।

আমি বলি, আস্তে, আস্তে—

পদ্ম আকাশের দিকে তাকায়। শুকতারা উঠে গেছে। আরও

ব্যস্ত হয়ে ওঠে, গতিবেগ আরও বাড়ায়। বলে, "সকাল হয়ে গেলে আর তুমি যেতে পারবে না। কোনদিন যাওয়া হবে না। এস, এস—বাঁধে উঠে পড়বে ভোর হওয়ার আগে।

পায়ে কত কাঁটা ফুটল, নখ ছিঁড়ে গেল উঁচু-নিচু মাটিতে আঘাত লেগে, শামুকে পা কাটল জলের মধ্য দিয়ে যেতে। সে যে কত পথ চললাম, তার হিসেব নেই। অবশেষে বাঁধ দেখতে পাচ্ছি—বাঁধের উপরের নেই গাছগুলো।

বাঁধের নিচে এসে পদ্ম হাত ছেড়ে দিল। বলে, দাঁড়াও একটু।

দুই পায়ে মাথা গুঁজে সে প্রণাম করল। অনেকক্ষণ ধরে করছে, ওঠে না।

সস্নেহে তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে বলি, আবার দেখা হবে পদ্ম। আমি আসব।

গাছে চড়ার মতন দু-হাতে ধরে ধরে উঁচু বাঁধে উঠছি। নোনা নদী ঝিকমিক করছে গোলঝাড়ের ওদিকে। গা শিরশির করে ওঠে—বড্ড শীত।

পদ্ম, জ্বর আসার মতন মনে হচ্ছে। কাঁপুনি লেগেছে।

কোথায় পদ্ম! তাকিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। বাঁধের আড়ালে পালিয়ে কৌতুক করছে বুঝি!

পদ্ম, পদ্মরাণী—

মুক্ত আকাশ-তলে গাঙের কিনারে শীতে কাঁপতে কাঁপতে কত ডাকলাম! পদ্ম যেন বাতাসের সঙ্গে মিশে গেছে।

সকাল হল। দিনের আলোয় মাঠের দিকে তাকিয়ে অবাক। মাঠ কোথা, বিশাল জলাভূমি। কিন্তু আমি যে এই কেওড়াগাছ-তলা থেকে ডাইনে নেমে বিয়েবাড়ি গিয়েছিলাম। ভুল হবে কেমন করে? ঠোক্কর খেয়ে ডান-পায়ের একটা নখ উল্টে গেছে। আর জামার পকেট ভর্তি পদ্মর দেওয়া স্বর্ণচাঁপা। জলের মধ্যে আর যাই হোক, স্বর্ণচাঁপা ফুটবার কথা নয়।

কপাল ভাল—বিকালবেলাই নৌকো পেয়ে গেলাম। গোলপাতা কাটতে এসেছিল, ফিরে যাচ্ছে। নৌকো না পেলে রাত্রিবেলা জলজঙ্গলের মধ্যে বাঘের পেটে না-ও যদি যাই—অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় কার্তিকমাসের নতুন হিমে কেওড়াতলায় নিশ্চয় মরে পড়ে থাকতাম। আরও এক তাজ্জব—কাল সবে এসেছি, একদিনের মধ্যে বোশেখ থেকে কার্তিকমাসে পৌঁছুই কি করে?

তুকড়ি মাঝি মাতলায় থাকে। এ ক'দিন অনেকের সঙ্গে এই গল্প করেছি। নৌকো থেকে ডাঙায় পা দিয়েই তু-কড়ির কাছে গেলাম। বাদাবনের সকল সুলুকসন্ধান তার নখদর্পণে। এখন শক্তিসামর্থ্য নেই, আর বাদায় যেতে পারে না, তু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে বসে তামাক টানে। লোকজন কাউকে পেলে বাদাবনের গল্প শোনায়।

তুকড়ি বলে, জায়গাটা চিনলাম—শোলাদানার বাঁওড়। শোলাদানা বলে জমজমাট এক গাঁ ছিল—ভূমিকম্পে বসে গিয়ে বাঁওড় হল সেখানে। পুরো গ্রামই আছে জলের তলে, দায়ে-দরকারে কখনোসখনো ভেসে ওঠে। শোলাদানায় গিয়ে তুমি যে আবার ফিরে এলে—এমন কখনো হয় না। জোর কপাল বটে তোমার!